স্বরূপে সন্ত্রাসী

২০০২-এর ১৫ জুলাই সোমবার আমার বিয়ের দিন। বাড়িতে সবাই ভীষণ খুশি, আনন্দিত। তবে সবচেয়ে আনন্দের দিন আমার। আমি একটু বেশি মাত্রায় খুশি। শুনেছি বিয়ের কলেমা পড়ার সময় মেয়েরা কাদে। আমি একটুও কাদিনি। সারা জীবন ধরে চোখের পানি ফেলতে হবে বলেই হয়তো এ সময় আমার মুখে হাসির ছোয়া ছিল। আমার বড় বোন, মা, বরপক্ষের ভাবী সবার চোখই তখন অশ্রুসজল। বড় ভাবী বলেও ফেললেন, সে জানলো না যে কি করলো, তাই হাসছে।

যাহোক, ভালোভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলো। কথা ছিল দুই মাস পর আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বশুরবাড়ি যাবো। সেই মতো বরপক্ষ ওই বিকেলে চলে গেল।

যাওয়ার আগে বড় ভাবী বললেন, অপেক্ষা করো কিছুদিন, পরে আমরা আসছি।

আজ তিন মাস পর মনে হয় এ অপেক্ষা শুধু অপেক্ষাই। এর শেষ দীর্ঘশ্বাসে।

বিয়ের কিছুদিন পর ঘটলো চরম বিপর্যয়। হঠাৎ শুনলাম মানুষরূপী এক নরপিশাচ শয়তান ছেলের বাড়িতে বলেছে, আমি নাকি তার বৌ। কথাটা যে কি ভীষণ মিথ্যা সে তো আমি জানি আর যে বলছে সে জানে।

কুখ্যাত সন্ত্রাসী এই শয়তানটাকে কলেজ জীবনে বন্ধুর মতোই জানতাম। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে আমাকে ভালো সম্পর্ক রাখতে হতো। তা না হলে রাস্তাঘাটে ভীষণ ডিসটার্ব করতো। আমার পড়াশোনা যখন শেষ পর্যায়ে তখন একদিন জোর করে একশ টাকার স্ট্যাম্পের ওপর সই করিয়ে নেয়। পরে আমার অনুপস্থিতিতে কিভাবে যে সেটা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে উকিলের মাধ্যমে সত্যায়িত করলো তা আমার বুদ্ধিতে আসে না। বাংলাদেশের কিছু উকিল এতোই জঘন্য পর্যায়ে নেমে গেছে যে, একটা মেয়েকে সামনে না দেখে কিভাবে তারা একাকে সত্যায়িত করলো! একটা মেয়ের জীবনকে এভাবে ধ্বংস করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধলো না? কষ্ট লাগে এটা ভেবে যে, নোটারি পাবলিকের যে দুজনের সিল ছিল তার মধ্যে একজন ছিল মহিলা উকিল, অন্যজন হাজি।

যাহোক, এই সিল লাগানো স্ট্যাম্প অনেক কষ্টে ওই সন্ত্রাসীর কাছ থেকে উদ্ধার করি এবং তার সামনেই ছিড়ে ফেলি। তাকে অনেকবার জিজ্ঞাসাও করেছিলাম এর কোনো ফটোকপি আছে কি না।

সে কসম করে বললো, তার কাছে কোনো কপি নেই।

আমিও নির্দ্বিধায় তা বিশ্বাস করলাম। যেহেতু ভেবেছিলাম আর কোনো কপি নেই, তাই বাড়িতে জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি। চরম বোকামি ও ভুল করলাম ওই সন্ত্রাসীর কথা সরলভাবে বিশ্বাস করে। এখন বাড়ির সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছে কেন আমি জানাইনি তাদের। আমিই যেখানে কাগজটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানি না, তাদের কিভাবে জানাবো?

বিয়ের পর আমার এক আত্মীয়ের বাসায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করে সব কথা তাকে খুলে বলি। ব্যক্তি জীবনে এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে কথা বলিনি। কিন্তু তার কাছে প্রথম মাথা নত করলাম স্বামী বলে তাকে সারা জীবন বিশ্বাস করবো বলে। তার শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম। এবং আমার আন্তরিকতার সম্পূর্ণটাই নিবেদন করে তাকে বোঝালাম।

কিন্তু হায়রে কপাল আমার! একমাত্র যাকে আমার মনের মণিকোঠার স্থান দিলাম, যার ওপর নির্ভর করে আমার বাকিটা জীবন পার করতে চাইলাম আমাকে সে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলো না। ওই সন্ত্রাসীর কথাটাই তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো। অবাক লাগে যখন দেখি একটা সন্ত্রাসী সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা কাগজ দেখালো আর তাতে বিশ্বাস করে আমার বিয়ের স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে ওই সন্ত্রাসীর হাতে তুলে দিতে চাইছে!

এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বলেই তো বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম। নেই লোকবল, নেই অর্থবল। অথচ বর্তমানে আমাকে ওই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কোর্ট কেস করতে হবে। জানি না আদৌ কোর্ট-কাছারি থেকে মুক্ত হতে পারবো কি না। পারলেও তার জন্য কতোখানি খেসারত দিতে হবে।

এদিকে সন্ত্রাসীটা হুমকি দিচ্ছে আমাকে এসিড মারবে। ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রিটা এক বছর আগেই নিয়েছি। কিন্তু স্বেচ্ছাবন্দী এই আমার ভবিষ্যৎ দারুণ অন্ধকারে ঢাকা। মানুষরূপী এক হিংস্র শয়তান আমার জীবন তছনছ করলো। আর যাকে আমি আশ্রয় করে বাকিটা পথ চলতে চাইলাম সে আমাকে ছুড়ে ধুলায় ফেলে দিল। অথচ বিয়ের আগে চাকরি করছিলাম, কমপিউটার শিখছিলাম, কি সুন্দর জীবন ছিল আমার। এই পৃথিবীতে সত্য বলে কিছু থাকলে আমার আন্তরিকতার মূল্য একদিন আমার স্বামীকে দিতেই হবে।

আল্লাহর কাছে রাত-দিন প্রার্থনা জানাই, সে যেন আমাকে সঠিক পথের দিশা দেখায়। সে-ই মহাবিচারক। তার বিচারের জন্যই বেচে আছি।

নাম ও পূর্ণঠিকানাবিহীন, খুলনা থেকে

*আপনার আইনি লড়াইয়ে সাহায্যের জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধ করতে চাই। সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন চিঠিতে। –**যাযাদি***

বংশ রক্ষা

– হেলাল উদ্দীন চৌধুরী

অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে মেয়েটির একটি নকল নাম দিলাম নন্দিনী। চট্টগ্রামের প্রথম দশজন ধনীর তালিকায় নন্দিনীর বাবার নাম থাকার কথা। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান নন্দিনীর ছিল হেলেন অফ ট্রয়, কুইন অফ শিবা এবং ক্লিওপাট্রা-র মতো ভুবনমোহিনী রূপ। আরো ছিল ধন-সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা এবং অন্যান্য মানবিক ও বৈষয়িক গুণাবলী। সবই ছিল এই রূপবতীর। ছিল না শুধু মা হওয়ার ক্ষমতা। নারীর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছিল তারই জীবন বাচানোর প্রয়োজনে।

আমরা ছিলাম অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব পরবর্তী কালে ভালোবাসায় রূপ নেয়। এক সময় আমাদের ভালোবাসার কথা নন্দিনীর বাবা-মা জানতে পারে। আমাদের সম্পর্ক তারা কখনোই খারাপ চোখে দেখেননি। আমি এবং আমাদের পরিবার সামাজিক মর্যাদায় তাদের প্রায় সমকক্ষ ছিলাম। হয়তো সে কারণেই পুরো ব্যাপারটাতে তাদের ছিল নীরব সমর্থন।

এভাবেই দিন যেতে থাকে। এক সময় নন্দিনী এবং আমি বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করি। ঠিক করলাম, নন্দিনীর মায়ের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে খোলামেলা আলাপ করবো। আমাকে

আপন সন্তানের মতোই তিনি স্নেহ করেন। নন্দিনীর মায়ের সঙ্গে আমাদের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি সোফায় বসা অবস্থায় কাদতে শুরু করেন। ততোক্ষণে ঘটনার আকস্মিকতায় মোটামুটি হতবাক হয়ে পড়ি।

আমার অবাক হওয়াটা সম্পূর্ণ হলো যখন তিনি বললেন, তুমি হয়তো জানো না বাবা, আমার মেয়ে কখনোই মা হতে পারবে না। আমি হয়তো তোমাকে গর্ভে ধারণ করিনি। কিন্তু আপন সন্তানের মতোই ভালোবাসি। তাই তোমার অজান্তে তোমাকে ঠকাতে চাই না। আমার মেয়ে তোমাকে হারানোর ভয়েই কথাগুলো এতোদিন তোমাকে জানায়নি।

ভদ্রমহিলার কথাগুলো শুনে বজ্রাহতের মতো বসে রইলাম। ফিরে এলাম বাসায়। কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি। অবশেষে নন্দিনীকে বললাম, এ বিয়ে হবেই।

এর কিছুদিন পর আমার অফিসের ঠিকানায় একটি চিঠি পেলাম।

নন্দিনী লিখেছে, *হেলাল, নিজের সঙ্গে এক প্রকার যুদ্ধ করে তোমাকে লিখতে বসলাম। তোমাকে আমি কি পরিমাণ ভালোবাসি যদি কখনো আল্লাহপাকের সঙ্গে পরকালে তোমার দেখা হয় তাহলে তার কাছ থেকে এই ভালোবাসার পরিমাণ জেনে নিও। আর তোমাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি বলেই তোমাকে ঠকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অন্য কোনো নন্দিনীকে বিয়ে করে সুখী হও। তোমার উত্তরাধিকারী পৃথিবীতে রেখে যাওয়া জরুরি।*

প্রায় এক বছর হাজারো চেষ্টা করেও নন্দিনীর সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ করতে পারিনি। আমার বাবা মাকে সব কিছু জানিয়ে এই বিয়ের জন্য চাপ দিলাম। তারা শুধু বংশ রক্ষার জন্য আমার সমস্ত স্বপ্ন ও ভালোবাসাকে পদদলিত করে নতুন বৌ ঘরে আনলো। এখন আমাদের বিবাহিত জীবনের পাচ বছর চলছে।

কিন্তু এখনো বংশ রক্ষা হয়নি।

হয়তো বিধাতা আসমানে বসে মুচকি হাসছেন।

নন্দিনী এখনো একাকী রাত কাটায়।

চট্টগ্রাম থেকে

দূরের অফিসে

– সায়ফুল ইসলাম

ঈদ আসছে আনন্দ বেদনার দোলায় চড়ে। এই ঈদ যেমন আনন্দের তেমনি নিরানন্দেরও। কোথাও এদিন আনন্দের ফল্গুধারা উপচে পড়ে আবার কোথাও বেদনার অশ্রু ঝরে নীরবে।

পরদেশে নিসঙ্গ, স্বজনহীনরা ঈদের এই আনন্দদিনে শিকার হন এক নীল কষ্টের। স্বদেশ আর স্বজনত্যাগী শূন্য হৃদয় প্রবাসীরা কষ্টের আগুনে পুড়ে দিনটি অতিবাহিত করেন।

আমারও প্রায় এক কুড়ি নিঃসঙ্গ ঈদ কেটেছে স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে প্রিয়জনহীন দূর প্রবাসে। ঈদে বিরহের যাতনা সয়েছি এই ধূ ধূ মরুভূমি, নাঙ্গা পাহাড় আর লোহিত সাগরের নোনাজল বেষ্টিত সউদি আরবের সুপ্রাচীন বন্দর নগরী জেদ্দাতে। এই স্বেচ্ছা নির্বাসনে ঈদের সেই সব দিনগুলোতে হৃদয় ক্ষরিত নীল যন্ত্রণা মরুর এই তপ্ত বালুচরে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

ছোটবেলার ঈদের কথা আজো খুব মনে পড়ে। ঈদের দুই চার দিন আগ থেকেই চাকরি আর পড়ুয়া অগ্রজ নিজ নিজ কর্মস্থল ও হল ডরমিটরি ছেড়ে একে একে আমাদের গ্রামের বাড়ি এসে জড়ো হতো। এক অফুরন্ত অনাবিল আনন্দে কয়েকদিনের জন্য সারা বাড়ি উৎসব মুখর হয়ে উঠতো। আজ তারাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছেন দূর-দূরান্তে, দেশ-দেশান্তে। বর্ষ চক্রে প্রতি বছর দুই দুবার আজো সেই কাঙ্ক্ষিত ঈদ আসে, ঈদ যায়। কিন্তু হায়! সেই গ্রামীণ আনন্দমেলা আজ আর জমে না, জমবেও না কোনোদিন।

এ দেশে সূর্যোদয়ের পর পরই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। নামাজ শেষে নিঃসঙ্গতার কষ্ট ভুলতে অনেকেই ঘরে ফিরে আবার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। দিনটি কাটিয়ে দেন ঘুমের ঘোরে। কেউবা টিভি ভিসিপিতে ম্যারাথন সিনেমা দেখে স্বজনদের ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। আবার কেউ টেলিফোন বুথে ভিড় জমান আত্মীয়পরিজনদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে। এছাড়াও ঈদের ছুটির এই অবকাশে দূর-দূরান্তের শহর-বন্দর থেকে ধর্মভীরুদের একটি অংশ ওমরা পালন ও রাসূলের (সাঃ) মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে পবিত্র নগরী মক্কা-মদিনায় চলে যান।

গত আগস্টে বাৎসরিক ছুটি কাটিয়ে এলাম। স্বপ্নের মতো দ্রুত ফুরিয়ে গেল ছুটির কয়েকদিন ছেলেমেয়েদের একান্ত সান্নিধ্যে। ফিরতিকালে বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে সিঅফ করতে আসা আমার ছোট্ট ছেলে ও মেয়েটি মাল ভর্তি আমার ট্রলিটি আনন্দ ভরে ঠেলে ঠেলে কাউন্টারে নিয়ে গেল। তাদের উৎসুক কর্মতৎপরতা দেখে মনে হচ্ছিল তারাও আমার সহগামী, বিদেশযাত্রী। টিকেট, পাসপোর্ট জমা দিয়ে বোর্ডিং পাস পেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো তা বোঝার বয়স আমার ওই অবোধ শিশু দুটোর হয়নি।

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। এক সময় হতবাক ওই ছোট্ট আদুরে মুখগুলোকে পেছনে রেখে ভেতরে রওনা হলাম। যতোদূর দেখা গেল হাত নেড়ে আমার প্রাণপ্রিয় সোনামণিদের বিদায় জানাতে গিয়ে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

এতোক্ষণে তারাও আচ করতে পেরেছে তাদের আব্বু তাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। বাসায় ফেরার পথে বাপঘেষা অবুঝ মেয়েটি অঝোরে কেদেছে। তার এ কান্না থামানো যায়নি রাত গভীরে ঘুমানো পর্যন্ত। ছোট্ট ছেলেটিও নির্বাক, নিশ্চুপ। তার খেলনা প্লেনটি হাতে নিয়ে বলে, আমার আব্বু এই প্লেনে চড়ে ভো করে চলে গেছেন। কর্মস্থলে পৌছার সংবাদ দিয়ে ফোন করলে এসব কষ্ট কাহিনী জেনে মনটা আরো গভীর বিষণ্নতায় ভরে গেল। এমনি বেদনা ভরা স্মৃতি প্রায় সব প্রবাসী পিতাদেরই।

আমার অবুঝ মেয়েটির নিত্য প্রশ্ন, তোমার আসতে এতো দেরি হয় কেন আব্বু?

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে বলি, আমার অফিসটি যে অনেক দূরে। তাই তো আসতে দেরি হয়।

তার ছোট্ট মুখের আকুতি ভরা পাল্টা প্রশ্ন, তোমার অফিসটি কি কাছে নিয়ে আসতে পারো না?

তার বান্ধবীদের আব্বুরা তো প্রতি সন্ধ্যায়ই বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু তার আব্বু যে আসে না। তার আব্বু কেন আসে না তা কে বোঝাবে এ অবোধ শিশুকে।

তার আরো অনুযোগ, এই ছোট্ট ঘরের চৌহদ্দিতে বাসাবন্দী জীবন তার ভালো লাগে না। তার আব্বু দেশে নেই। তাই তাদের কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। যাওয়া হয় না শিশুপার্কে, ওয়ান্ডারল্যান্ড, চিড়িয়াখানা বা অন্য কোথাও।

এসব অভিযোগের কোনো জবাবই তার ছোট্ট মন মেনে নেয় না। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, তোমার জন্যে অনেক খেলনা, চকলেট আর সাজগোজের সরঞ্জাম আনতেই তো দূরের অফিসে যেতে হয়। সে ত্বরিত প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, ওসব তো অনেক হয়েছে। আর এসব আনতে হবে না। আমরা শুধু তোমাকেই কাছে পেতে চাই। সন্তানদের এই শিশু জীবনে পিতৃস্নেহের এ নিদারুণ অভাব বোধে আমিও গভীরভাবে বিচলিত হই।

একই অনুভূতি আমারও। কাছে পেতে চাই আমিও আমার সন্তানদের নিত্যদিন। তাহলেও তাদের অনাগত দিনের সুখের সন্ধানে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এক বুক হাহাকার আর বঞ্চনার ঝুলি কাধে নিত্যদিন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি রিয়াল নামের সোনার হরিণ ধরবো বলে এই মরুভূমির মরীচিকায়।

নিজ ভূমে ছেড়ে আসা ওই কচি কচি প্রিয় মুখগুলো ঈদের আনন্দঘন এই দিনে আমাদেরকে এক যন্ত্রণার সাগরে নিমজ্জিত করে। ঈদের পূর্ণ আনন্দ থেকে তারাও কিছুটা বঞ্চিত হয়। আর পুরোপুরিই বঞ্চিত হই আমরা প্রবাসীরা।

ঈদুল ফিতরের এই কল্যাণময় শুভক্ষণে সুদূর প্রবাস থেকে আমার স্নেহ আদরের আশিক, আহমেদ ও সাদিয়া মামণিকে অজস্র ঈদ শুভেচ্ছা রইলো। আর তেমনি একরাশ শুভেচ্ছা আমার গিন্নি, আরো সব প্রিয়জন এবং স্বদেশবাসীদেরও।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

শোক

মাত্র সতেরো বছরে মা হয়েছি। বাচ্চার বয়স চার মাস। আব্বার বাড়িতে আছি। ঈদের দিন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আনাগোনা। আব্বা সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

সকাল থেকে কিছু খাইনি। অপলক দৃষ্টিতে লুনার দিকে চেয়ে আছি। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কোলে উঠালাম, চুমু দিলাম। ঘুমোও লক্ষ্মী সোনা। আজ তার আব্বার কথা মনে হচ্ছে। পিকনিকের নামে সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলাম। শহীদ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ছিল। মামাতো ভাই। আব্বা তড়িঘড়ি করে বিয়ে দিয়ে ফেললেন এক শিল্পপতির ছেলের সঙ্গে। নাম মামুন। প্রথম রাতে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝরে গেল। লজ্জা পেয়ে চলে গেল হোটেলে। পরে জেনেছিলাম, সে একজন চরিত্রহীন। হোটেলে রক্ষিতা নিয়ে রাত কাটায়। নাচ গানে সময় কাটায়। সিফিলিসের রোগী।

শহীদ গোপনে দেখা করতো। সব কিছু জেনে গেলেন আব্বা। মাকে পেটালেন, আমার প্রতি রাগ ওঠালেন মাকে মেরে। বাবার নির্মম বাহিনী ছিল। লিডারের নাম ছিল রাসেল মিয়া। তার সঙ্গে কি যেন শলাপরামর্শ করলো।

শহীদকে ডেকে নিয়ে গেল তার বন্ধুরা একটা মীমাংসার জন্য। সে ছিল ছাত্রনেতা। সে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছামাত্র সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে মাথার খোল কয়েক টুকরো করে ফেললো। রাস্তায় ফেলে চলে গেল।

পুলিশ কোনো ক্লু বের করতে পরলো না। কেউ গ্রেফতার হলো না। শহীদের আব্বার সঙ্গে আমার আব্বা শোক পালন করলো। কয়েক হাজার টাকা খরচ করে মিলাদ মাহফিল করলো।
অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছি।
ঈদের আনন্দ, কিছুতেই আমাকে খুশি করতে পারবে না।
শুধু শহীদের স্মৃতি আর স্মৃতি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শাস্তি

– আরিফ

গত রোজার ঈদের প্রায় সাত মাস আগে আমাদের পাশের বাসায় এক নবদম্পতি বাসা ভাড়া নিয়েছিল। দম্পতির পতিদেবতা ছিল অতিমাত্রায় ধর্মপরায়ণ এবং গোয়ার। দেখতেও তেমন সুন্দর নয়, বরং কুৎসিত কালো বলা যায়। কিন্তু জায়াদেবীটি ছিল অসাধারণ। যেমন ফর্শা তেমন স্বাস্থ্যবতী। তার উন্নত বুক দেখলে আমার সব কিছু উল্টা–পাল্টা হয়ে যেতো।
শুরু থেকেই তাকে ভাবী বলে ডাকতাম। ভাবীও তার স্বামীর মত ধর্মপরায়ণ কিন্তু বেশি মাত্রায় না। ভাবীর প্রতি এক প্রকার জৈবিক আকর্ষণ অনুভব করতাম। তাই তার সঙ্গে খুব দ্রুত সম্পর্ক স্থানে করলাম। অবশ্যই দেবর–ভাবী সম্পর্ক। কারণ এতে বিভিন্ন সময় চান্স নেয়ার সুযোগ আছে। একদিন সেই রকম একটা চান্স নিলাম। ভাবীকে একলা পেয়ে জড়িয়ে ধরে তার কোমল ঠোটজোড়া মুখে পুরে চুষলাম। ভাবী প্রথম হতবাক হয়ে গেলেন। পরে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়েছিলেন। ততক্ষণে আমি এক মধুর আবেগে বহমান। কিন্তু আবেশটি বেশিক্ষণ রইলো না। একটু পরে আমার ডান গালে ভাবীর সজোরে থাপ্পড় অনুভব করলাম। জীবনে প্রথম কোনো নারীর হাতে চড় খেলাম।
মেজাজ গেল বিগড়ে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। এর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ভাবী তার স্বামীকে খুব ভয় পান।
রোজা এলো। আমিও ভাবির সঙ্গে মোটামুটি ফৃ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ভাবী আমাকে দেখলে এড়িয়ে চলতেন। রোজা দশ–বারোটা গেল। রোজার ধকল প্রায় সবার শরীরে পরিলক্ষিত হয় যারা রোজা রাখে। কিন্তু ভাবীর শরীরে রোজা রাখার কোনো চিহ্ন নেই। তাই মনে হয় ভাবী রোজা রাখেন না। এ কথা একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করতেই খুব রাগারাগি করলেন। এতে আমার সন্দেহ দ্বিগুণ বাড়লো। ভাবছি কি উপায়ে বের করবো তিনি ভাবী রোজা রাখেন না। অনেক ভেবে একটা উপায় বের করলাম।
আগেই বলেছি, ভাবী আমাকে চড় মারার পর থেকে প্রতিশোধের আশায় তার অনেক কাজ লক্ষ্য করেছি যার মধ্যে একটা হলো, প্রতিদিন তিনি তার স্বামীকে অফিসে যাবার সময় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন বাসার দরজা খোলা রেখে। একদিন তিনি যখন বাইরে গেলেন সেই ফাকে তার ঘরে ঢুকে খাটের নিচে লুকিয়ে রইলাম। ভাবী ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সংসারের কাজ করতে লাগলেন। আমি খাটের নিচে ঠায় শুয়ে আছি। দুপুর হলো। ভাবী গোসল করে রান্নাঘরে গেলেন। আমিও খাটের নিচ থেকে বের হয়ে রান্নাঘরে গেলাম। দেখি ভাবী ভাত খাচ্ছেন। আমার সঙ্গে তখন একটা ক্যামেরা ছিল। ছবি তুললাম। শাটারের আওয়াজে ভাবী চমকে উঠলেন। পেছন

ফিরে আমাকে দেখলেন। বিস্ময়ে তার দুচোখ কপালে। রান্নাঘর থেকে এসে তার বেডরুমে বসলাম। ভাবী এলেন কিছুক্ষণ পর। সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ছবি দিয়ে আমি কি করবো। তাই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও?

আমিও সরাসরি বললাম, তুমি জানো, আমি কি চাই।

তিনি কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন। ঘরের দরজা জানালা ভালো করে বন্ধ করে শাড়ি খুলে বিছানায় শুলেন। তার ব্লাউজ আবৃত দুটি বিশাল বুক দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। ক্ষিপ্র হাতে খুললাম ব্লাউজ, ব্রা, পেটিকোট। তারপর সুখের সাগরে সাতার কাটা শুরু করলাম।

সাতার কাটা শেষে উঠে দেখি তার দুচোখ উপচে পানি বেরোচ্ছে। বুঝলাম তিনি কাদছেন। আমার মনে তখন সহানুভূতি জানানোর অবকাশ ছিল না। তার নরম দেহের সান্নিধ্যে পাগল হয়ে উঠলাম। আবার উপভোগ করলাম তাকে।

চলে আসার সময় তিনি বললেন, একজন সতী নারীকে তুমি অপমান করলে। দোয়া করি, একজন ভালো মানুষ হও।

তখন বুঝিনি যে, তিনি আমাকে অভিশাপ দিলেন।

বুঝলাম এর মাস খানেক পর যখন হাসপাতালে প্রায় তিন মাস শুয়েছিলাম দুর্ঘটনায় পা হারানোর পর।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

রয়াল ডান্স ট্রুপ

– ফারাহ্ আজাদ দোলন

ভুটানে যাবার কিছুদিন পরই একটি রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমরা আমন্ত্রিত হলাম। উপলক্ষ থাইল্যান্ডের যুবরাজের ভুটান সফর। কাজেই রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন উক্ত অনুষ্ঠানে। অতএব এ সুযোগ মিস করা যাবে না।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল নয়টার মধ্যেই পৌছে গেলাম থিম্পু জংয়ে। এটা একই সঙ্গে রাজ কার্যালয়, সচিবালয় এবং আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। থিম্পুতে এটিই সবচেয়ে বিশাল স্থাপনা এবং প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। বড় বড় পাথরের টুকরো আর কাঠ সহযোগে প্রস্তুত দ্বিতল ভবন। অন্যান্য জংগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল।

থিম্পু জংয়ের ঠিক পাশের বয়ে গেছে থিম্পু রিভার। নদীর অপর পাশে গড়ে উঠেছে নবনির্মিত বিশাল সার্ক বিল্ডিং। আধুনিক স্থাপত্য কৌশল আর বৌদ্ধ ধর্মের ট্রাডিশনাল আর্ট তংখার সমন্বয়ে এটা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ভবন। জানি না কোনোদিন ভুটানে সার্ক সম্মেলন করা সম্ভব হবে কি না। কিন্তু ভবনটি ওই উপলক্ষেই নির্মিত।

থিম্পু জংয়ের ভেতরে ঢুকে দর্শকদের সারিতে আসন গ্রহণ করলাম। এখানে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিই আমন্ত্রিত যেখানে সাধারণের প্রবেশের সুযোগ নেই। কেননা রাজা কখনো সাধারণ জনগণের সামনে আসেন না। চারদিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম, নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম যদিও সকলেই সস্ত্রীক আমন্ত্রিত। এখানে সুযোগ পেলেই মহিলারা পার্টিতে বা টেনিসের মাঠে সারা দিন কাটান। এটা তো আরো বড় ব্যাপার যেখানে স্বয়ং রাজা রানীরা উপস্থিত থাকবেন। দেখলাম,

জুনিয়রদের মধ্যে আমি একাই মহিলা। এবং যারা মহিলা তারা হয় নিজেরা কোনো সংস্থার শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা, না হলে তেমন কারো স্ত্রী।

ইনডিয়ান ফার্স্ট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলো আমার হাজব্যান্ড, তোমাদের স্ত্রীরা আসেননি কেন?

রাজীব বললো, তারা খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে নাচ–গান দেখতে দেখতে। তোমরা নতুন তাই এসেছো। একবার দেখলে তোমরাও টায়ার্ড হয়ে যাবে।

দেখলাম রাজা রানী ও রাজ অতিথি বসার স্থান বেশ দূরে। ইতিমধ্যে চার রানী আসন গ্রহণ করেছেন। এরপর রাজা ও অতিথি অপর আরেক প্রবেশ পথ দিয়ে এসে হেটে গেলেন আমাদের সামনে দিয়ে। ভুটান রাজ সুদর্শন। অনেকটা অভিনেতা ব্রুস লি–র মতো দেখতে। রাজা সামনে এলে ভুটানিজ হাই অফিশিয়ালরা সবাই দাড়িয়ে মাথা নিচু করে থাকলেন। সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী তারা কখনো রাজার দিকে তাকান না। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সার্ক নেতাদের মধ্যে অক্সফোর্ডে পড়া ভুটান রাজের ব্যক্তিত্বই সবচেয়ে বেশি।

রাজার আসন গ্রহণের পরই শুরু হলো অনুষ্ঠান। কোনো ভাষণ বা উপস্থাপনার ধারেকাছেও ঘেষলো না দেখে বিশেষ প্রীত হলাম রাজতন্ত্রের প্রতি। পরে জেনেছি রাজা কখনো ভাষণ দেন না জনসমক্ষে বা বেতার মাধ্যমেও। অর্থাৎ গণতন্ত্রের নেতাদের মতো তাকে যখন–তখন চিৎকার করে গলা ব্যথা করার দরকার হয় না। যা বলার মন্ত্রীরাই বলেন, তাতে রাজার মতামত প্রতিফলিত হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের নেতাদের সব সময় নিজের গুণগুলো দেশের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হয় এবং তিনি কতো কাজের তার ফিরিস্তি দিতে হয়। কিন্তু রাজার তো তার প্রয়োজন নেই। তার সমস্ত গুণ জন্মগতভাবেই পাওয়া। তিনি তো সমস্ত দোষের উর্ধে। আর তার গুণাবলী সম্পর্কে জনগণ ভালোভাবেই জানে। তার তো নিজেকে জাহির করার দরকার নেই।

শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান। বাজিয়েরা আগেই এলো। একজন বড় ধরনের একটি ড্রাম জোরে জোরে পেটাতে লাগলো। আরেকজন বিশাল দুটি পেতলের থালা ঢং ঢং করে বাজাতে লাগলো। অন্যজন মস্ত বড় দুটো পাইপ জাতীয় বস্তু এক সঙ্গে জুড়ে শিংগার মতো বানিয়ে তাতে ভীষণ জোরে ফু দিয়ে সৃষ্টি করলো ছন্দহীন বিকট শব্দ। যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে যে দল নাচতে থাকলো তারাই সেই বিখ্যাত *রয়াল ডান্স ট্রুপ* যাদের মুখে বিচিত্র রঙিন মুখোশ। সেই মুখোশগুলো বিভিন্ন জন্তু, জানোয়ারদের অথবা কাল্পনিক সব প্রাণীর যারা কি না ভয়ানকভাবে মুখ ব্যাদান করে আছে। পরনে তাদের বিচিত্র পোশাক। কোথাও ঝালর, কোথাও কুচি, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ নানান রঙের সমাহারে তৈরি জমকালো সব পোশাক।

যেমন পোশাকের বাহার তেমনি বিকট অঙ্গভঙ্গির নাচ এবং ভীষণ চিৎকার। আমরা যারা এর অর্থ বুঝি না তাদের কাছে এ এক ভীষণ দৃষ্টিকটু ব্যাপার। বিভিন্ন দলের সেই স্থূল লম্ফ–ঝম্ফ যখন দেখছিলাম তখন মনে হলো আর কতোক্ষণ। বত্রিশটি দাত বের করে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। পেছনের সারিতে বসা ভুটানিজদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা এই নাচ বেশ উপভোগ করছে।

হঠাৎ আমার পাশের বৃদ্ধা বিদেশিনী বললেন, এরা সব সময়ই খুব কালারফুল, তাই না?

বললাম, ইয়েস, অফ কোর্স। মনে মনে বললাম, ধন্য তোমাদের ভদ্রতা বোধ।

আরেক বিদেশিনী প্রশ্ন করলেন, তোমাদের বাংলাদেশের কালচারও কি ভুটানের মতোই।

মনে মনে রেগে বললাম, বালাই-ষাট, আমাদের সংস্কৃতি এতো স্থূল হতে যাবে কেন? মুখে বললাম, আমাদের একটি সুন্দর সংস্কৃতি আছে। আমরা গরিব। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি অনেক রিচ (ৎরপয)। মনে হলো, আইরিশ ফ্রেন্ড মিউবেল আমায় বলেছিল, ভুটানের নাচ-গান তাদের খাবারের মতোই একঘেয়ে।

কিন্তু ভুটানে অনেক ভালো কিছু আছে যা আমাদের নেই। তাদের নেই দুর্নীতি কিংবা সন্ত্রাস। তারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিদের ভালোবাসে। ভুটানের রাজা ভালোবাসেন আলাউদ্দিনের মিষ্টি। তাদের রাজতন্ত্র তাদের ভাষায় আমাদের গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

জেলখানায়

– মাহমুদ আলম খন্দকার মামুন

ঈদ নিয়ে আমার একটি কষ্টকর অভিজ্ঞতা আছে। বেশ কিছু বছর আগের ঘটনা। আমি তখন প্রবাসে কর্মরত। বাহরেইন-এর এক কম্পানিতে কাজ করি। অনেক বছর দেশে ঈদ করা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, ঈদে ছুটি পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার।

যাই হোক। সে বছর রমজানের ঈদ দেশে করবো মনস্থির করলাম। কিন্তু ছুটি পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক ঝামেলার পর ছুটি পাই। ঈদের ঠিক দুই দিন আগের ডেটে বাংলাদেশ বিমানের টিকেট ওকে করি। দেশেও সবাইকে খবরটি জানিয়ে দিই। এরপর বেশ উৎসাহ নিয়ে কেনাকাটায় ঝাপিয়ে পড়ি। যাবার দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে টেনশনও বাড়তে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে লাগেজ, টিকেট ও পাসপোর্টসহ এয়ারপোর্টে হাজির হই।

কিন্তু বিপত্তি শুরু হয় ইমিগ্রেশন কাউন্টার থেকে।

পাসপোর্ট এগিয়ে দেয়ার পর ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট দেখে আমার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুচকালো।

আমি আতকে উঠলাম।

সে বললো, পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে আমার ছবির মিল নেই। আমি জাল পাসপোর্টে দেশে যাবার চেষ্টা করছি। এ অভিযোগে পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে এলো। কতো করে ওদের বোঝালাম, এটা আমার পাসপোর্ট আমার ফটো আমার স্থানীয় আইডি কার্ড দেখলাম।

কিছুতেই কিছু হলো না।

পাসপোর্টে লাগানো আমার ছবিটি ছিল কিছু পুরনো, এ জন্যই যতো সমস্যার সূত্রপাত। পরদিন ছিল শুক্রবার। বাহরেইনে ঈদ। তার পরদিন বাংলাদেশে ঈদ। দেশে সবাই আমার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, অথচ আমি ঈদ করছি জেলে বসে।

দুপুরের দিকে দুটি শুকনো রুটি ও মিষ্টি জাতীয় কিছু একটা আমাকে দেয়া হলো। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে এসব ছুয়েও দেখিনি। পরদিন আমাকে ফোন করার সুযোগ দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গেই কম্পানিতে ফোন করে বিস্তারিত জানালাম। কম্পানি ম্যানেজার এসে আমাকে থানা থেকে বের

করে নিয়ে গেল। কিন্তু পুলিশ আমার পাসপোর্ট রেখে দিল। অনেকেই তখন আমাকে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিল। ওই সময় বাহরেইনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক। ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে দেখা করে আমার বিস্তারিত সমস্যার কথা বললাম। তিনি এ ব্যাপারে ওনার অপারগতার কথা জানান। এতে আমি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ি। ওদিকে দেশে আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ভীষণ টেনশনে দিন কাটাতে থাকে। অবশেষে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর পর স্থানীয় এক প্রভাবশালী বাহরেইনি ভদ্রলোকের সহায়হায় সে যাত্রায় রক্ষা পাই। তবে সে বছর আমার দেশে এসে রমজান, এমনকি কোরবানির ঈদ করা হয়নি।

আজো যখন প্রবাসে ঈদ আসে, ওই বিভীষিকাময় ঈদ যাত্রার কথা ভুলতে পারি না।

আল জাহরা, কুয়েত থেকে

আমিশগ্রামে নিরামিষ ভ্রমণ

– ফাহমিদা আমিন

চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী একবার আমাকে বলেছিলেন, আপা। আপনি তো প্রায়ই আমেরিকা যান একবার সময় করে আমিশদের গ্রাম একটু দেখে আসবেন, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার-স্যাপার তাদের, বিংশ শতাব্দীতে বসে তারা আঠারো শহরের চাল-চলন ধরে রেখেছে। তারা মোটরকার চড়ে না, রেডিও-টেলিভিশন শোনে না, দেখে না, তাদের ভিলেজে ইলেকট্রসিটি নেই।

শুনে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। এটা কি সম্ভব? অবশ্য মি. চৌধুরীর কাছে শোনার আগে আমি এ আমিশ শব্দটিই শুনিনি। তখন থেকেই মাথায় ছিল সময় এবং সুযোগ পেলেই আমিশদের গ্রাম দেখবো। তার বর্ণনা অনুযায়ী মাঝে মধ্যে এমন সাজ পোশাকের মানুষ (আমিশ) দেখেছি মনে হয়, তবে তাদের রক্ষণশীল ইহুদি বলেই মনে করেছিলাম।

এবার আমেরিকা আসার সময়ই মনে মনে ঠিক করে এসেছিলাম, আমিশ গ্রাম দেখবো সময় এবং সুযোগ মতো। এসেছি শীতকালে, ডিসেম্বর ২০০১ সাল। সে সময় গ্রামে যাওয়ার যায় না। আমাকে সামারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আমার ছেলেরা এমনই বাপের সুপুত্র যে না চাইতেই হাজার জিনিস হাজির করে বাপ-মায়ের হাতের কাছে। কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখে না। বাপ-মা চাইলে তো মনে হয় পারলে চন্দ্র-সূর্যও পেড়ে এনে হাতে ধরিয়ে দেবে। বাপ তো গেছেন ভালোয় ভালোয়। সবেধন নীলমণি মা আছে। তার কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখা চলবে না। ইচ্ছাটা মুখে প্রকাশ করতেই তোড়জোর শুরু হয়ে গেল।

ভার্জিনিয়া থেকে কলিন বললো, আমার কাছে চলে এসো আম্মা, আমি তোমাকে আমিশ গ্রাম দেখাবো।

সেন্ট লুইস থেকে জেলিন ফোন করলো, আমরাও আমিশ গ্রাম দেখেনি, তুমি এসো, এক সঙ্গে দেখতে যাবো।

বৌমা তুহিন বললো, গ্রাম দেখতে যাওয়ার আগে হ্যারিসন ফোর্ডের *উইটনেস* সিনেমাটা দেখে নিও মা, আমিশদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।

অলিম্পিয়ায় পৃন্সকে যখন বলেছিলাম সেও তখন এই উইটনেস সিনেমাটার কথা বলেছিল। গল্পটা আমিশ গ্রামের পটভূতিতে চিত্রায়িত।

ছোট ছেলে ইমন এবং বৌমা নাজমা আর বলাবলির মধ্যে না গিয়ে একেবারে প্রোগ্রাম করে ফেললো। রবিবার, ৯ জুন ২০০২–এ ক্লিভল্যান্ড যাওয়ার পথে আমরা আমিশ গ্রাম সডোর ভিলেজ দেখতে যাবো। টলি থেকে সডার ভিলেজ গাড়িতে মোটে এক ঘণ্টার পথ। আমরা ঠিক লাঞ্চের সময় সডার ভিলেজ পৌছলাম। এখন বন্ধ। লাঞ্চের পরই খুলবে। আমরাও তাই লাঞ্চ সেরে নিলাম গাড়িতে বসেই। একটার সময় ওয়েলকাম সেন্টার–এর দরজা খুললো। এই সেন্টারের একদিকে গিফট শপ, আরেকদিকে রেস্তোরা। আমরা টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ওয়েলকাম সেন্টার থেকে ভেতরের দিকে নেমে গোল চত্বর। এই চত্বরকে ঘিরে এক সারি ছোট ছোট কুটির। পেছনে আরো এক সারি ছোট কুটির। চত্বরে বড় বড় কিছু গাছ জায়গাকে ছায়াময় করে রেখেছে। কি দেখবো, কাকে দেখবো কোনো ধারণাই ছিল না আমাদের। দেখলাম কুটিরগুলোর কোল ঘেষে বাধানো রাস্তা। রাস্তা থেকে উঠে বারান্দা, ছোট কুটিরগুলো যেন আমাদের গ্রামের কোনো দোকান ঘর। এক এক কুটিরে এক এক প্রকার জিনিস সাজানো রয়েছে। কাউন্টারের বসে কোনো মহিলা বা পুরুষ দর্শকদের সে বস্তুটি তৈরি করার কলাকৌশল দেখাচ্ছেন বা সে বিষয়ে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। বয়স্কা মহিলারাই কাউন্টারে বসে আছেন বেশির ভাগ।

আসলে এটা একটা সাজানো মিউজিয়াম। ছোট ছোট কুটিরে আমিশদের সেকেলে এবং একেলে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র সাজানো বা তারা নিজেরাই তৈরি করে। কোনো কুটিরে সুতা কাটা হচ্ছে ভেড়ার লোমের। তাই দিয়ে তৈরি হচ্ছে হাতে বোনা পোশাক, কোথাও ব্ল্যাকঅ্যাশ ট্রর ছাল পাতলা করে তুলে নিয়ে ঝুড়ি বুনে রাখা হচ্ছে, কোথাও কাঠের পাতলা টুকরো দিয়ে বালতি বাথটাব বানানো হয়েছে। নিশ্ছিদ্র সেসব পাত্র থেকে এক ফোটাও পানি পড়ে না। টিনস্মিথ শপ, কুপার শপ, হার্ব শপ, রথ বারবার শপ, দি বরুম শপ, অ্যানাস স্পিনিং শপ ইত্যাদি নামে সাজানো দোকানগুলো একে একে দেখলাম। নামেই যার পরিচয় মেলে। কাসারি, কুমার, তাতী, চাষী সবই আছে। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমাদের কোনো একটা গ্রামকে যদি এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয় তাহলেই তো তা এক অসাধারণ দ্রষ্টব্যে পরিণত হবে। জেলের ঝাকি জাল, পোলো, চাই কিংবা কামারের হাপর, কুমারের চাক, স্বর্ণাকারের ক্ষুদ্র সরঞ্জাম সব কিছুই কৌতূহলের উদ্রেক ঘটাতে পারে। গরুর লাঙ্গল, মইয়ের চাষ, গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, পালকি সবই সাজিয়ে রাখা যায়। আগ্রহী দর্শকদের চড়িয়ে আনন্দ দেয়া যায়।

আমরা সডার ভিলেজে ছোট টয় ট্রেনে চড়লাম। ছাদ খোলা ছোট ট্রেনের ছোট সিটে বড়রা কোনো রকমে বসতে পারে। কু ঝিক ঝিক করতে করতে সেটা পুরো ভিলেজকে এক চক্কর ঘুরে আসে। ঘোড়ায় চড়ে, ঘোড়া গাড়ি চড়েও ঘোরা যায়। আমিশদের এই ঘোড়ার গাড়িগুলোকে বলা হয় *বাগি* (ঈলথথধণ)। একটা বড় শেডে রয়েছে কুইল্ট এবং যন্ত্রপাতি ও সেকেলে গাড়ির প্রদর্শনী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেসব বাহন ব্যবহৃত হয়। দোলনা থেকে শবাধার বহনকারী গাড়ি পর্যন্ত সাজানো রয়েছে। সাজানো রয়েছে স্লেজ এবং ছাউনি দেয়া ঘোড়ার গাড়ি। কৃষি কাজে ব্যবহৃত হস্তচালিত মেশিন, মেশিননারিজ। আমিশ মহিলাদের উৎপাদিত একটি প্রধান কুটির শিল্প হচ্ছে কুইল্ট বা লেপ। সুন্দর রঙের, সুন্দর কাপড়ের বিভিন্ন ডিজাইনের কুইল্ট তৈরি করা হয়েছে। হাতে বোনাও আছে। এ সমস্ত আবার শেখানোরও হয়ে থাকে এখানে। ছোট লগ হাউস, এক ঘরের

স্কুল ঘর, অ্যানিমাল ফার্ম হাউস যেখানে গরু, ঘোড়া, শুয়র, খরগোশ, হাস, মুরগি, ছাগল সব আছে। সব দেখলাম। আঠারো শতকের মধ্যবিত্তের বাড়ি সাজানো আছে যার বেসমেন্টে বা সেলার–এ রয়েছে ঘরে তৈরি আচার–মোরাব্বা, জুস, জ্যাম, জেলির বোয়ম থরে থরে সাজানো। আঙিনায় রয়েছে সামার কিচেন, স্মোক হাউস, ফ্রুট এবং ভেজিটেবল ড্রাইয়ার। এক বয়স্কা মহিলা উঠানে বসে মেথি শাকের মতো কি এক শাক বাছছেন। এটি নাকি শুকিয়ে রাখা হয় এবং রান্নায় সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমি মনে করেছিলাম, পনিরের গোল্লা। পরে দেখলাম, না, সাবানের গোল্লা। হাতে তৈরি সাবান তারের চালনে ঘষে ঘষে গুড়ো সাবানের মতো করা হচ্ছে। তাই দিয়ে কাপড় ধোয়া হবে। এ সমস্তই প্রদর্শনীর। বসতবাটিতে কর্তা–গিন্নি এবং সন্তানদের রুম সাজানো রয়েছে। রয়েছে ক্ষণিকের অতিথি এবং দীর্ঘ দিনের অতিথিদের জন্য বেডরুম, অতিথি শিশুদের জন্য ছোট ছোট বেড, ঘর গরম করার ব্যবস্থা। পায়ের নিচে রাখা গরম পানির পাত্র, কম্বল। রাতের বাথরুমের জন্য প্রত্যেক খাটের তলায় পাটি। দিনে আঙিনা পেরিয়ে যেতে হয় টয়লেটে। বড়দের বড় সিট, ছোটদের ছোট সিট।

ওয়াটারমিল, উহন্ডমিল। এসব ছাড়াও আছে ছোট ছোট হাজতখানা (জেল)। সামাজিক অপরাধের এখানে বন্দী করে রাখা হতো। হাজতের দরজায় ঝুলে আছে হাতকড়া।

সডার ভিলেজ থেকে বের হয়ে প্রথম যে কথাটা বললাম তা হলো, আমি জ্যান্ত আমিশ দেখতে চাই। এই সাজানো মিউজিয়ামে দেখে আমার মন ভরেনি। নিরামিষ নিরামিষ লেগেছে। আমি দেখতে চাই আমিশদের নিজস্ব জনবসতি, তাদের গ্রাম, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তাদের সম্বন্ধে জানতে চাই। জানার তাগিদে কিছু হোমওয়ার্ক করে নিলাম, *উইটনেস* সিনেমাটা দেখে নিলাম। সিনেমাটার গল্প এ রকম – এক আমিশ তরুণী বিধবার শিশু সন্তান স্টেশনের টয়লেটে এক খুনের ঘটনা দেখে ফেলে। খুনিও তাকে দেখে। শিশুটি ও তার মা যখন ভয়ে আতংকে দিশাহারা তখন এক পুলিশ অফিসার (হ্যারিসন ফোর্ড) তাদের সাহস জোগায় এবং নিরাপদ আশ্রয়ে রাখে। কারণ শিশুটিই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। শিশুটি ফটো দেখে খুনিকে চিনিয়ে দেয়। খুনি এবং তার সহযোগীরাও পুলিশের লোক। খুনি শিশুটিকে অপহরণ করতে চায়। সুযোগ বুঝে ফোর্ড–কে আহত করে। ফোর্ড সেই আহত অবস্থায় মা ও শিশুকে তাদের আমিশ গ্রামে নিরাপদে রেখে আসতে যায়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তরক্ষণে সে আর ফিরে আসতে পারে না। সেখানেই আমিশ ডাক্তারের ভেষজ রীতির চিকিৎসায় এবং তরুণীটির সেবা–যত্নে ভালো হয়ে ওঠে। পুলিশ অফিসার গ্রাম, তাদের রীতি–নীতি, ধর্ম, আচার–আচরণ, সমাজ–পরিবার সম্বন্ধে জানতে পারে। তরুণীর সঙ্গে পুলিশ অফিসারের হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু তরুণীটির পিতা তা মেনে নিতে পারে না। তার মতে, ইংলিশদের সঙ্গে আমিশদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। পরিশেষে অপরাধীরা ধরা পড়ে। পুলিশ অফিসার আমিশ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে।

শুধু উইটনেস সিনেমা দেখা নয়, আমিশদের সম্বন্ধে দুইটা বই পড়ে ফেললাম। ইবধ্রদ´দণ ফেটধভ ণেমযফণ অপরটি একটা দিনলিপি, ই ঢটহ ধভ´দণ ফধতণ মর´দণ ইবধ্রদ. সম্পাদক জানিয়েছেন, তেষট্টি আমিশ ফ্যামিলিকে তারা তাদের একদিনের জীবনযাত্রা অর্থাৎ দৈনন্দিন কর্মসূচির বিবরণ লিখতে বলেছিলেন। তারা তাই লিখেছেন। তারা লিখেছেন তাদের কঠিন পরিশ্রমের কথা, বিনোদনের কথা, উষ্ণ আতিথেয়তার কথা, খাদ্যাভাসের কথা, ধর্মাচরণের কথা। শাদামাটা আমিশ জীবনের সকাল থেকে সন্ধ্যার কাজকর্মের কথা তারা জানিয়েছেন সহজ সরলভাবে।

আমিশদের সম্বন্ধে আমেরিকানরাও কম জানে। কাজেই তাদের প্রতি সকলের কৌতূহল।
এক বাস ভর্তি লোক যদি তোমার দিকে কৌতূহল নিয়ে দেখতে থাকে তখন তোমার কেমন মনে হবে? মনে হবে নাকি যে, তুমি একটা চিড়িয়াখানার আজব জীব? এই জন্য মডার্ন শহরে যেতে আমিশরা অনীহা প্রকাশ করে। তারা কার, মোটর গাড়ি চড়ে না, বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না। অপসংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেয় না। আধুনিক জীবনযাত্রা যেমন আমাদের পরিবেশ দূষণের দিকে ঠেলে দেয়, আমিশদের সরল এবং সাধারণ জীবন পরিবেশ দূষণ রোধ করতে সহায়তা করে।

কারা এই আমিশ ?

আমরা জানি, সকল ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন মতবাদ এবং মতবিরোধ আছে। মতভেদে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। কোনো কোনো সময় সংঘাতও ঘটে থাকে। যেমন হয়েছে কৃশ্চিয়ান ধর্মের মধ্যেও। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট এ দুই মূল ধারা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে।
মধ্য যুগে ইওরোপে ধর্মীয় কারণে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ধর্মগোষ্ঠির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে।
ধর্মীয় নেতা মার্টিন লুথার–এর অনুসারীদের বলা হতো *লুথারান।* অপর একজন ধর্মীয় নেতার নাম মেনো সিমন্স। তার অনুসারীদের বলা হয় *মেনোনাইটস।*
মেনোনাইটস–রা ধর্মকে সরলীকরণ করতে চেয়েছেন। তারা মনে করতেন শিশুকালে ব্যাপটাইজড করাটা ভুল। শিশু এর ভালো–মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না। একটু বয়স হলেই ব্যাপটাইজ করা উচিত। আঠারো বছর বয়সকালে করাই উত্তম। এই নিয়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিরোধ বাধে। অনেক সময় মেনোনাইটস–দের গ্রেফতার করা হয়। হত্যাও করা হয়। অত্যাচার এতো বেড়ে যায় যে, তারা বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। এই সময় আর এক নেতার আবির্ভাব হয় যার নাম জেকব আমান। তার অনুসারীদের তিনি আরো শাদাসিধে সরল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন। সাধারণ কাপড় পরিধান করা, দাড়ি না ছাটার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। জেকব আমানের অনুসারীদেরই *আমিশ মেনোনাইটস* বলা হয়। পরবর্তী কালে শুধু আমিশ নামে পরিচিত হয়। জেকব আমন সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্স এবং জার্মান তার মতবাদ প্রচার করেন।
এই জন্য বেশির ভাগ আমিশ জার্মান ভাষায় কথা বলেন। তাদের ধর্মীয় সঙ্গীতও জার্মান ভাষায় রচিত। অন্য শ্বেতাঙ্গদের আমিশরা বলেন ইংলিশ।
ধর্মীয় কারণে দিনের পর দিন আমিশরা অত্যাচারিত হতে থাকে। কিন্তু তারা কখনো সংঘাত কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। আমিশরা সব সময় হিংসা–বিদ্বেষ–সংঘর্ষ–মারামারি এড়িয়ে চলে। অহিংসা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে, ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে তারা ইওরোপ থেকে আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৭৩৭ সালে হলান্ডের বন্দর রটারডাম থেকে একদল আমিশ *চার্মিং ন্যান্সি* নামে এক জাহাজে ইওরোপ থেকে আমেরিকা পাড়ি জমায়।
নামে চার্মিং হলেও তাদের যাত্রাটা চার্মিং ছিল না। জাহাজের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী থেকে এবং আজে–বাজে খাবার ও পানি খেয়ে তারা অধিকাংশই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই যাত্রায় অনেক শিশু এবং বয়স্ক লোকের মৃত্যু ঘটে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। শুধু এক যাত্রীর ব্যক্তিগত

ডায়রি থেকে যেটুকু জানা যায় তাতেই আন্দাজ করা যায় অবস্থার ভয়াবহতা। তিরাশি দিন পরে ফিলাডেলফিয়া–তে তাদের যাত্রা সমাপ্তি ঘটে। ধারণা করা হয় ১৭০০ সালের মধ্যে পুরুষ–মহিলা–শিশু মিলে পাচশ আমিশ ইওরোপ থেকে আমেরিকা আসে। ১৮০০ সালের মধ্যে তিন হাজার আমিশ এ দেশে এসে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে পেনসেলভানিয়া, ওহাইও, ইনডিয়ানা এবং কানাডা–র অন্টারিও–তে আমিশ বসতি বেশি।

আমিশদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী (১৯৮০) লোক সংখ্যা বর্তমানে এক লাখেরও বেশি।

পারিবারিক জীবন

আমিশরা বেশির ভাগই গ্রামবাসী কৃষিজীবী। তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী কৃষক। সব কর্মকাণ্ড তাদের পরিবারকে ঘিরে। তাদের ধর্ম–কর্ম, বিয়ে, মৃত্যু সব কিছুই তারা যেখানে বাস করে সে অবস্থানকে কেন্দ্র করে। এর বাইরে তারা যায় না। পরিবারই হলো তাদের সব কিছুর ভিত্তি। তাদের পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। এক এক পরিবারে গড়ে সাতজন ছেলেমেয়ে। দশ থেকে পনেরোজনও আছে। তারা পারিবারিক স্নেহ ছায়ায় বেড়ে ওঠে। শিশুদেরকে ঈশ্বরের দান হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের সেভাবেই যত্ন করা হয়। পারিবারিক শিক্ষা তারা পরিবার থেকেই পায়। একটু বড় হলে তাদের গুরুজনদের মান্য করতে শেখানো হয়, ছেলেরা ফার্মের কাজে পিতাকে এবং মেয়েরা ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে। মহিলারা ঘরের কাজ–কর্ম এবং সন্তান লালন–পালন করে। পুরুষরা পরিবার প্রতিপালন করে। ধর্মীয় আচার আচরণে আমিশ শিশুকে বাধ্য করা হয় না। একটু বড় হলে তারা এক ঘরের স্কুলে যায়। সেখানে তারা লেখাপড়া অংক কষা শেখে। প্রাথমিকভাবে পরিবারেই তারা ধর্মীয় শিক্ষা পায়, ধর্মীয় সঙ্গীত প্রার্থনা শেখে। কিন্তু আঠারো বছর না হলে চার্চে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে না।

সমাজ জীবন

আমিশরা আদর্শ কৃষক কৃষিকাজকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতোই পবিত্র মনে করে। তারা গোবরসার দেয়। মাথার ওপর দিয়ে ইলেকট্রক তার ঘরে নিয়ে যাওয়া তারা এখনো পছন্দ করে না। গ্যাসে লাইট জ্বলে, ফৃজ চলে, ওয়াশিং মেশিন চলে। সোমবার তাদের ওয়াশ ডে। কাপড় ধুয়ে লম্বা দড়িতে শুকাতে দেয়। ঘরে তৈরি সাবান ব্যবহার করে। বৃষ্টির পানিও কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহার করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জমির পরিমাণ কমে যাওয়া, জমির দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে অনেকেই এখন অন্য পেশায় চলে গেছে, বিশেষ করে কার্পনট্র–তে। আমিশদের তৈরি ফার্নিচারের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। কাউকে যদি এখন প্রশ্ন করা হয়, আমিশরা কি করে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলবে, ফার্নিচার তৈরি করে। একটা কথা চালু আছে – কদণহ দটশণ ফর্ম্ম মত ডদটধব্র ঠর্ল ভম´ধবণ´ম্র্ধ. অর্থাৎ, ওদের অনেক চেয়ার আছে কিন্তু বসার কোনো সময় নেই। এছাড়া কামার, কুমারের কাজ, ছোট ছোট কারখানায় কাজ করে। মহিলারা ইংলিশ গৃহে পরিচারিকার কাজ করে। কুইল্ট (বাহারি লেপ) বানায়, আচার–চাটনি, রুটি, নুডলস বানিয়ে বিক্রি করে ফলমূল, সবজি বেচে। রান্নার কাজ করে রেস্টুরেন্টে। শাক–সবজি বিশেষ পদ্ধতিতে শুকিয়ে রাখে। জুস, আচার, চাটনি বানিয়ে বেসমেন্টে সংরক্ষণ করে।

খাওয়ার আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা প্রার্থনা করে। লঢথণ ভর্ম, কদর্ট হণ ঠণ ভর্ম নলঢথণ. এটা তারা সব সময় মেনে চলে। অপরের দোষত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ছেলেমেয়েদের পাবলিক স্কুলেও পড়তে পাঠায়, আগে পাঠাতো না। বাচ্চা হওয়ার সময় এখন প্রয়োজনে হাসপাতালেও যায়। তবে ঘরে চিকিৎসা পেলে ঘরে থাকতেই পছন্দ করে। এমনকি বুড়ো হলে সোশাল সিকিউরিটি বেনিফিটসও নিতে চায় না। তাদের নিজের সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধা করতে চায়। পরিবারই বয়স্কদের ভার নেয়। তরুণ–তরুণীরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেয়। তবে বিয়েটা হয় পারিবারিকভাবেই।

পোশাক পরিচ্ছদ

পোশাক–পরিচ্ছদে আমিশরা খুবই রক্ষণশীল। মেয়েরা ঠাকুরমার মতো চুল বেধে পেছনে খোপা করে রাখে। তার ওপর পরে কান ঢাকা টুপি (হুড), পা পর্যন্ত কালো লম্বা জামা ছেলেরা গ্যালিস লাগানো কালো ঢোলা প্যান্ট, হ্যাট। বয়স্করা দাড়ি রাখে, গ্যালিস লাগানো প্যান্ট পরে, মাথায় চওড়া ঘেরওয়ালা স্ট্র হ্যাট। টুপিতে জড়ানো থাকে কালো ফিতা। কোটের বোতাম, হ্যাটের চওড়া কিনারা, হাই ব্ল্যাক শু আমিশদেরকে বৈশিষ্ট দিয়েছে।

কালো বাগিস মোটর গাড়ি নয় কেন?

শুধু কালো বাগিস (বাগি – ঈলথথহ, বহুবচন বাগিস – ঈলথথধণ্র) নয়, বিভিন্ন রঙের নব্বই রকমের বাগিস ব্যবহার করে আমিশরা। অরেঞ্জ, ব্রাউন, কালো, এক সিটের, দুই সিটের বন্ধ গাড়ি, এক সিটের, দুই সিটের খোলা গাড়ি। দুই চাকার রেসিং গাড়ি। ধীরগতি বলে বাগীগুলোর পেছনে কমলা রঙের ত্রিকোণা সাইনবোর্ড লাগানো আছে। ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে আমিশরা মৃদু হেসে জবাব দেয়। আমাদের গাড়ির ঘোড়াগুলো বাচ্চা উৎপাদন করে মনিবের সাশ্রয় করে আর তোমাদের মোটার কার শুধু ধারকর্জ ও খরচ এনে দেয়। পরিবেশ দূষিত করে। অবশ্য ঘোড়াগুলোও রাস্তায় তাল তাল মলত্যাগে মাধ্যমে রাস্তা নোংরা করে, পরিবেশ নষ্ট করে।
বার্ন রেইজিং তাদের একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এটা সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে হয়ে থাকে। যখন ফসল কাটা হয়, ঘরে তোলা হয়, তখন নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট জায়গায় গ্রামের সকল মানুষ জড়ো হয়। শক্ত সমর্থ পুরুষ মানুষরা কাঠের তক্তা দিয়ে খুটি দিয়ে নিজেরাই এক বিশাল বার্ন হাউস সারাদিনে খাড়া করে ফেলে। প্রতিবেশী কৃষকরা এই বার্ন হাউস গোলাবাড়ি শস্য দিয়ে ভরে দেয়। *দশের লাঠি একের বোঝা,* দশে মিলে এই বার্ন হাউস তৈরি করে। দুঃস্থ অভাবী আর দশজনেরই অধিকার থাকে অসময়ে এখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার। বার্ন রেইজিং তাদের উৎসবের দিন। ওই দিন পুরুষরা বার্ন হাউস তৈরি করে। মহিলারা সকলে মিলে রান্না করে। খাবার তৈরি করে, ছেলেমেয়েরা মুক্ত পরিবেশে মাঠে খেলাধুলা করে। খাবার সময় হলে সেই প্রাঙ্গণেই লম্বা লম্বা টেবিল পাতা হয়। সেখানে সকলে এক সঙ্গে বসে খায়। মহিলারা পরিবেশন করে। দিন শেষে বার্ন হাউস উঠে গেলে যে যার ঘরে চলে যায়।
আমিশরা বিশ্বাস করে, ঋটরফহ রধ্রণব্র ণভনমহ টর্ডধশণ ঢটহ্র. কদণ রণষটরদ্র মত দটরঢ ষমরপ. কমথর্ণদণরভণ্র টভঢ রমডপ–মফধঢ তটর্ধদ.
এক. যারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে তারা কর্মময় দিন পছন্দ করে **দুই.** কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়া যায় এবং **তিন.** একতাবদ্ধতা ও অটল বিশ্বাস।

আমিশরা কমছে, না তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠছে। তবে তারা অস্তিত্ব বজায় রাখতে বড় পরিবার বা বিগ ফ্যামিলি গঠন করতে আগ্রহী। অনেকেই আশংকা করে, আমিশরা তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে টিকে থাকতে পারবে না। একজন প্রফেসরের মতে, ইবধ্রদ ্রমডধর্ণহ ষধফফ ্রলরশধশণ ধত র্ধ পণণঘ্র থধশধভথ ´দণ ডদধফঢরণভ রটধ্রণঢ ধভ ইবধ্রদ দমবণ্র´দণ তণণফধভথ´দর্ট´দণধর ষটহ মত ফধতণ ষধফফ থধশর্ণ´দণব বমরণ ধভভণর ডমর্ভণর্ভবণর্ভ´দটভ টভহ র্মদণর ষটহ ডটভ মততণর. অর্থাৎ, আমিশরা বেচে থাকবে যদি আমিশ পরিবারে বড় হওয়া ছেলেমেয়েদের বোঝানো যায় যে অন্য যে কোনো পরিবেশের তুলনায় তাদের পরিবেশেই সবচেয়ে বেশি গভীর সুখ আছে।

এতো কিছু দেখে, পড়ে–শুনে আমার *জ্যান্ত আমিশ* আর *আমিশ গ্রাম* দেখার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। আমরা ২৭ জুলাই ২০০২–এ আমিশ গ্রাম বার্লিনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি, ছোট ছেলে ইমন, ছোট বৌমা নাজমা এবং তাদের দুই বাচ্চা ঝোরা আরাফা। বার্লিন, ওয়ালনাট কৃক, সুগার কৃক নিয়ে ওহাইও–র আমিশ বসতি। এটাই আমেরিকার সর্ববহৎ আমিশ বসতি। ২৭ জুলাইয়ের সকালে আমিশ গ্রাম বার্লিনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। ম্যাপে বোঝা যায়নি মনে হয়েছিল টলিডোর কাছেই বুঝি। কিন্তু চলতে চলতে পথ আর শেষ হয় না। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল যাকে বলে। তাই পৌছাতে চার পাচ ঘণ্টা লাগলো। তবে রাস্তা সুন্দর, মৃসৃণ, পিচঢালা। এ জন্য কষ্ট হয় না, অন্য পাচটা আমেরিকান গ্রামের মতোই। তবে গ্রামে ঢুকতেই বোঝা গেল পার্থক্যটা কোথায়। রাস্তার দুইপাশে হলুদ বর্ডার দেয়া। সেই বর্ডারের ভেতর ধীরগতি বাগিস চলবে, মধ্যে দ্রুতগতি কার, পিকআপ, ট্রাক ইত্যাদি। আমিশ গ্রামে যে এসে গেছি তাও মালুম হলো সেই বর্ডার দেয়া ফালি রাস্তায় ঘোড়ার বর্জ্য দেখে। একটু পরে বর্জ্য ত্যাগকারী ঘোড়া এবং তার টেনে নেয়া বাগিও দেখতে পেলাম। অসল ভঙ্গীতে টুক টুক করে চলেছে।

কোনো তাড়া নেই। তার পাশ দিয়ে সা সা করে চলে যাচ্ছে মোটর গাড়ি ব্যস্ত বাগিসের মতো, যতো তাড়া তাদের। আমরা প্রথমে এলাম বেহল্ট–এ। বেহল্ট মানে স্মরণ কিংবা সংরক্ষণ কিছু একটা হবে। বিহল্ট মেনোনাইটস ইনফরমেশন সেন্টার, সেখানে নেমে খোজ খবর নিয়ে আমরা প্রথমে গেলাম খেতে। নিরামিষই খেতে হলো। যত্রতত্র নিষিদ্ধ মাংসের ছড়াছড়ি, বিদেশ–বিভূইয়ে জাত খোয়াবো নাকি? বাফে লাঞ্চ খেয়ে আমরা এবার গেলাম ফার্মে। সেখানে টিকেট কেটে আমিশদের ঘোড়ার গাড়ি বাগিতে চড়লাম। এ ঘোড়ার গাড়িগুলো দেশের ঘোড়ার গাড়ির মতোই (ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি) শুধু সামনেটা খোলা এবং একটাই ঘোড়া টানে। একজন, দুইজন, তিনজন পর্যন্ত বসার ব্যবস্থা আছে। শুনেছিলাম আমিশরা ফটো তুলতে চায় না। ঘোড়ার গাড়িরচালকও আমার সঙ্গে ফটো তুলতে আপত্তি জানালো। কিন্তু ইমন তাকে নিয়ে আমার ছবি তুলে নিল। ঘোড়ার গাড়ি সামান্য এক চক্কর দিয়েই আমাদের নামিয়ে দিল।

এই ফার্মে কয়েকটা গরু, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, মুরগি আছে। বাচ্চারা তাদের পেয়ে খুশি, গলা জড়িয়ে ধরে ফটো তুলছে। এছাড়া এখানে আছে গিফট শপ।

ফার্ম থেকে ফিরে পুরো আমিশ গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। ফার্নিচার, বেকারি এবং পনির বানানোর সব ছোট ছোট ফ্যাক্টরি। সোমবার তাদের হাউসহোল্ড ওয়াশডে হলেও আজো অনেক বাড়িতে লম্বা লম্বা দড়িতে কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে, বাড়ির বারান্দায় কিংবা লনে। আমেরিকান বাড়িতে যা কখনো দেখা যায় না। ঘুরেফিরে আমরা আবার বেহল্টে ফিরে এলাম। টিকেট কেটে আমরা

প্রথমে দেখলাম আমিশদের নির্মিত, পরিচালিত এবং অভিনীত একটা ভিডিও। ভিডিওতে আমিশদের জীবনযাত্রা ধারাভাষ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সেটা দেখে আমরা এবার মুরাল দেখতে একটা গোল গ্যালারিতে ঢুকলাম। মস্ত গোল গ্যালারির দেয়াল জুড়ে চক্রাকারে আমিশদের ধর্মীয় ইতিহাসের মুরাল। ২৬৪ ফিট দীর্ঘ এবং বারো ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মুরালে বারোশ চরিত্র আকা হয়েছে, তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে চিত্রের মাধ্যমে। যিশুখৃস্ট, ম্যাথাউ, লুক, লুথার্ন, জেকর আমন প্রমুখ বহু ধর্মীয় নেতার ছবি রয়েছে। আমাদের ধারাভাষ্যকার বয়স্ক, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। নাম এটলি। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে আমাদের ইতিহাস বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে আমার দেড় বছরের নাতি আরাফা বুঝে গিয়েছিল যে এই হলে চিৎকার করলে ইকো হয়। সে ধর্ম, ইতিহাস, ভুগোল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সমানে চিৎকার করে চলেছিল। এটলি ভদ্রমহোদয় সত্যিই ভদ্রলোক, সেই ম্যারাথন চিৎকারের মধ্যেই ধৈর্যসহকারে তার ধারা বর্ণনা শেষ করলেন। আমি তাকে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলাম।

তিনি জানালেন, তার পরিবারে তার স্ত্রী, নয় ছেলেমেয়ে এবং চল্লিশজন নাতি-নাতনি। তার ঘরে ইলেকট্রসিটি নেই, টিভি নেই, মোটর গাড়ি নেই। শীতকালে খোলা বাগিতে চড়ে চলাচল করলে ঠাণ্ডা লাগে কি না জিজ্ঞাসা করায় জানালেন শীতকালে গাড়ি পর্দা ঘেরা থাকে। কম্বল, হট ওয়াটার ব্যাগ ইত্যাদি থাকে, পায়ের কাছে থাকে ওয়ার্ম ওয়াটার পট। আমিশদের স্কুলেই তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করেছে। এক রুম স্কুল থেকে জুনিয়র স্কুলে যায়। হাই স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতেও পড়তে যায় কেউ কেউ। মেয়েরা হুড এবং লম্বা ঝুলের পুরো হাতা জামা পরে, কারণ আমাদের মতো তারা বিশ্বাস করে, খোলামেলা পোশাকে চলাফেরা করলে সামাজিক অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যায়। শুনে বুঝলাম ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং সামাজিক আচার-আচরণে তারা আমাদেরই মতো।

বেহল্ট-এ ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডিক্রাফটস শপ আছে একটা। সেখানে বিশ্বের দশ হাজার গ্রাম থেকে হস্তশিল্প সংগ্রহ করা হয়েছে। সে গ্রামগুলোর মধ্যে ভারত, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া যেমন আছে তেমনি আছে বাংলাদেশ। কতোকগুলো পাটের তৈরি জিনিস দেখে আগ্রহী হয়ে কাছে যেতেই দেখি লেখা মেড ইন বাংলাদেশ। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আমিশ গ্রামে টেন থাউজেন্ডস ভিলেজের মধ্যে নিজের দেশের নামটা দেখেই যেন চোখটা জুড়িয়ে গেল। একটা মানসিক প্রশান্তি নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

চট্টগ্রাম থেকে

ইটালিয়ান

– অনিরা

মজার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। গত মার্চে পরিবারের কয়েকজন মিলে ইনডিয়া বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের সাতজনের ওই দলে আমার এক ফুপাতো বোনও ছিল। আমার এই বোন দিলমে লাগা চাক্কু মার্কা সুন্দরী।

রাস্তায় বের হলে সবাই তার দিকে নিজেদের চোখ সুপারগ্লু দিয়ে আটকে রাখে। পাড়ার কতো ছেলের মন দিয়ে সে সকালে নাশতা সারে আর কতো ছেলের দীর্ঘশ্বাস জুসের সঙ্গে চিনির মতো ঘুটা মেরে গিলে ফেলে তার হিসাব করতে হলে ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে হবে। এমনকি বাস, ট্রেনে মাঝে মধ্যে কিছু সাহসী ছেলে তাকে নিজেদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার পর্যন্ত দিয়ে বসে। কোন ছেলে তার জন্য উল্টি খেয়েছে, পাল্টি খাবো খাবো করছে, ডিগবাজি খাবার প্ল্যান করছে, এসব নিত্যনতুন ঘটনার মনোযোগী শ্রোতা আমি তার কথা শুনি এবং ভাবি। বোন রে, আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে আমিও...।

অন্যদিকে আমি সোজা বাংলায়, একজন উন্নতমানের ক্ষ্যাত। দেখতে খুব সাধারণ। বিশেষ করে কোনো মেকআপ, গহনা, ঝিক-ঝাক ড্রেসবিহীন আমি তার মতো ঝকঝকে মেয়ের পাশে রীতিমতো একটা হাবিজাবি এবং বোরিং মাল।

যাহোক, ঘটনা হয়েছে যখন আমরা *তাজমহল* দেখতে গেলাম আগ্রায়।

তখন টুরিস্ট সিজন ছিল। আমাদের আশপাশে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা একগাদা টুরিস্ট। আমার অবশ্য অন্যদিকে খেয়াল নেই। কারণ তাজমহল দেখে টাসকি খেয়ে ততোক্ষণে আমার খবর হয়ে গেছে। অবশ্য আমার বোনের দৃষ্টি অন্যদিকে। একটু পর পর কনুই দিয়ে আমাকে খোচা মারছে আর একেকজনকে দেখিয়ে বলছে, দেখো, দেখো। ওই ছেলেটা কি সুন্দর, কি ফিগার, কি চেহারা! কি... (সেন্সরড)। এর মধ্যে বিশেষ করে একটা ছেলেকে তার খুব মনে ধরলো। দেখতে বেশ সুন্দর। ইটালিয়ানদের মতো চেহারা।

আমার বোনের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে একটু পর *ধুত্তোর, ছেলের গুষ্ঠি কিলাই* বলে তাকে ভাগিয়ে দিলাম। আমার বোন এরপর আমাকে ছেড়ে ওই ছেলের পেছন পেছন ঘুরতে লাগলো। আর কখনো চুল ঝাকিয়ে, কোমর দুলিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগলো।

যাই হোক। এর মধ্যে প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে। আমার মাথা থেকে ততোক্ষণে তাজমহল আর যমুনা নদী ছাড়া সব আউট। দাড়িয়ে দাড়িয়ে যমুনার শোভা দেখছি এবং শাহজাহান সাহেব ওই পাড়ে কালো রঙ-এর আরেকটা তাজমহল কেন বানাতে পারলেন না এই ধরনের দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করছি। হঠাৎ পেছন থেকে *এক্সকিউজ মি* শুনে চমকে তাকিয়ে আমার চোখ তাল গাছ। কি খেল! সেই ইটালিয়ান। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে বললো, অনুমতি দিলে আমার একটা ছবি সে তুলতে চায়।

চারদিকে একবার জেমস বন্ড-এর মতো সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে রাজি হলাম।

ছবি তোলা শেষ হলে যাবার সময় সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললো শাদা তাজমহলের সামনে কালো ড্রেসে আমাকে দেখতে নাকি তার কাছে অপূর্ব লাগছে।

সেদিন আমার পরনে ছিল কালো সালোয়ার কামিজ আর কালো ওড়না। ব্যাটার নিশ্চয়ই চোখ খারাপ!

পরে বুঝলাম ঘটনা আমার বোন মিস করেনি। হায়! বেরসিক চোখ খারাপ ইটালিয়ান। সবার দিলে চাক্কু লাগানো আমার সুন্দরী কাজিনের দিলে রামদা লাগিয়ে চলে গেল।

হোটেলে ফেরার সময় গাড়িতে আমার বোন গণপিটুনি খাওয়া ছিনতাইকারীর মতো মুখ বানিয়ে ফিশ ফিশ করে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, ওই ছেলেটা তোকে কি বলছিল রে?

মুখে একটা রহস্যময় হাসি ঝুলিয়ে বললাম, বলছিল, আপনার বোনটা খুব সুন্দর!

ভাগ্যিস

– ফারহানা তেহসীন

আমরা তখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম। মেরিন ক্লাস টু পরীক্ষা দিতে সিঙ্গাপুর পলিটেকনিক–এ শিক্ষারত আমার স্বামী। উইকএন্ড–এ আমরা টুরিস্ট প্লেসগুলো ঘুরে ঘুরে উপভোগ করতাম। সেখানে পরীক্ষা ফিস, খাওয়া–দাওয়া, বাড়ি ভাড়া, গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল, যাতায়াত খরচ ছাড়াও আনুষঙ্গিক অন্য খরচ ও ভ্রমণ খরচসহ আমাদের এক বছরে মোট খরচ হয় সাত লাখ টাকা। আরো অনেক মেরিনাররা পরীক্ষা দিতে ভিড় করেছে সেখানে। কাড়ি কাড়ি টাকা কারোর নেই। সবাই হিসাব করে চলে। এরপরও প্রায় সবারই কম বেশি ধার–কর্জ করতে হয়।

আমাদের ভ্রমণের শখ ছিল খুব বেশি। সিঙ্গাপুরে এমন কোনো দর্শনীয় স্থান ছিল না যেখানে আমরা যাইনি। ম্যাকডোনাল্ডসের লোভ সামলে আমরা পয়সা বাচাতাম। ট্যাকসিতে না উঠে আমরা এমআরটি (স্কাই রেল) বা বাসে উঠে পয়সা বাচাতে চেষ্টা করতাম যাতে ধার–কর্জ না হয় এবং সব টুরিস্ট স্পটগুলো দেখে যেতে পারি। কারণ সেসবের এন্ট্রান্স ফি ছিল বেশি।

অন্যরা যখন সুবিখ্যাত সেন্তোসা–য় গিয়ে তিন চারটে জিনিস দেখেই ফিরে আসছে সে সময় আমরা সব দর্শনীয় বিষয়বস্তু দুই দিনব্যাপী দেখি টিকেট কেটে। সকাল আটটায় বের হয়ে রাত নয়টায় ফিরতাম। তখন সেন্তোসায় দুই দিনের প্যাকেজ টিকেট দেয়া হচ্ছিল যার সঙ্গে লাকি ড্র সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয় দিন আমার স্বামী আতিক কুপনগুলো পূরণ করে বক্সে ফেলে দিল।

দিন যায়, আমি হেটে বা বাসে করে প্রায় রোজ এদিক–ওদিক চলে যেতাম, ঘুরতাম, দেখতাম। ঘোরাঘুরিতে কিছুদিন পর পর বাস কার্ড শেষ হয়ে যায়। দশ ডলার দিয়ে বাস কার্ড ভরতে হয় প্রতি সপ্তাহে। টাকা ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। দেশে ফেরার সময় হয়তো কারো জন্য সামান্য উপহারও কিনে নিতে পারবো না। দেশে ফোন করা কমিয়ে দিলাম। এসি চালাই না বিল দেয়ার ভয়ে। এমনকি কাছের জায়গাগুলোতে যেখানে বাসে ষাট সেন্ট করে কাটতে হয় সেখানে হেটে যাওয়া শুরু করলাম। এমনকি বাস ভাড়ার হাত থেকে বাচার জন্য সাইকেল কিনলো আতিক । প্রচণ্ড রোদে সে দুই কলেজ আসা–যাওয়া করে সাইকেল চালিয়ে। ঘামে ভিজে ঘরে ফেরে। তারপরও খুব দুশ্চিন্তা হয়। ধারকর্জ ছাড়া মান–ইজ্জত নিয়ে দেশে ফিরতে হবে তো! স্বপ্ন ছিল ভালো কিছু কেনাকাটা করার। মালয়শিয়া বা ব্যাংকক যাওয়ার..., কিছুই হবে না। না হোক, যা টাকা আছে তাতে বাকি দিনগুলো চলে গেলে হয়। রোজ নামাজ পড়ে তসবিহ জপি আল্লাহ মেহেরবান।

এই কষ্ট সহিষ্ণুতার দিনগুলোতে একদিন টেলিফোন বেজে উঠলো। ইংরেজিতে একজন আতিকের নাম ধরে চাইলো। ডেকে দিলাম। টেলিফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কথা শুনতে শুনতে আতিকের চোখ–মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

সেন্তোসা–র লাকি ড্র–র দ্বিতীয় পুরস্কারটি জিতেছে আতিক। একষট্টি ইঞ্চি ফিলিপস টেলিভিশন। এতো বড় টিভি জন্মেও দেখিনি। সিঙ্গাপুরের কোনো শোরুমে একষট্টি ইঞ্চি টিভি রাখা হয় না। কেউ অর্ডার দিলে এনে রাখে। তবে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি পর্যন্ত শোরুমে থাকে।

এই টিভি দেশে নিয়ে আসার ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। তাছাড়া ওটা বিশাল হলঘর ছাড়া মানাবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম বিক্রি করে দেবো। এখানে কিছুদিন আরাম করে থাকি। হাতে কিছু অতিরিক্ত থাকুক, কোথাও ধার-কর্জ করতে হবে না।

দেশে আসার আগে ওটা আমরা বিক্রি করে দিই এক লাখ পচিশ হাজার টাকায় এক সিঙ্গাপুরির কাছে। সেই টাকা দিয়ে আতিক তার বহুদিনের শখ পূরণ করে একটি ভিডিও ক্যামেরা কেনে। তিন দিনের জন্য আমরা মালয়শিয়া ভ্রমণে যাই এবং দেশে ফেরার সময় প্রিয়জনদের জন্য উপহার কিনি প্রাণভরে।

আজ ভাবি, ভাগ্যিস, সেদিন দুজনে মিলে সেন্তোসা-তে বেড়াতে গিয়েছিলাম। একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে – *গড হেলপস দেম, হু হেলপ দেমসেলভস।*

চট্টগ্রাম থেকে

জামা

– মোহাম্মদ কাওসার আলী রিপন

ঈদুল ফিতরের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। গ্রামের বাড়িতে ঈদ করতে যাবো সবাই মিলে। ওখানে বাবা-মা আছেন। আমি এবং এক বোন শহরে বড় ভাইয়ের বাসাতে থেকে পড়াশোনা করি। একটি ছোট কাজের মেয়ে আমাদের দেখাশোনার জন্য থাকে। আমাদের ঈদের কেনাকাটা প্রায় শেষ। বাকি শুধু কাজের ছোট মেয়েটি। তার জামা-কাপড় কেনার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। নিউ মার্কেটে জামা কিনলে বেশি দাম পড়বে। তাই ফুটপাথের দোকান থেকে তার জামা কিনতে হবে। ঈদের সময় গরিবদের জন্য ফুটপাথে রমরমা ব্যবসা জমে।

দোকানে গিয়ে দেখলাম, একজন ভদ্রমহিলা একটি জামা হাতে নিয়ে দরাদরি করছেন। তার সঙ্গে দুটি মেয়ে। একজনের বয়স হবে পনেরো ষোল। আরেকজনের নয় দশ। বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি তার ছোট মেয়েটির জন্য দরাদরি করছেন।

আমাদের কাজের মেয়েটি পাশের ছোট মেয়েটির চেয়ে কয়েক বছরের বড় হলেও শারীরিক দিক দিয়ে সমান হবে। তাই মেয়েটিকে দেখিয়ে তার সাইজের জামা দেখাতে বললাম। দুই তিনটা জামা দেখার পর একটা পছন্দ করে কিনলাম। কেনা শেষ হলে চলে আসবো হঠাৎ শুনলাম, পনেরো টাকার জন্য জামাটা দেবেন না? কথাটা মহিলাটি দোকানদারকে বললেন।

দোকানদার বললো ওই টাকাতে তার কোনো লাভ থাকবে না। তাই যে দাম বলা হয়েছে সেটাই দিতে হবে।

তাদের পাশে গিয়ে দাড়ালাম।

মহিলা হঠাৎই একটু রেগে গিয়ে বললেন, বললাম তো, আমার কাছে আর কোনো টাকা নেই। থাকলে আপনার সঙ্গে এতো কথা বলতাম নাকি?

দোকানদার তবুও অনড়।

বড় মেয়েটি এতোক্ষণ চুপ ছিল। এবার মাকে বললো, আর দশটা টাকাও নেই?

ভাবটা এমন যেন ও দশ টাকা আছে বললেই দোকানদার করুণা করে জামাটা দিয়ে দেবে। অতো বড় একটা মেয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছে। সুতরাং দোকানদার না দিয়ে পারবেই না।

দাড়িয়ে তাদের দরকষাকষি দেখছি। একটি গরিব ঘরের তরুণীর কাছে এ যে কতো লজ্জার বিষয় তা সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে নিজেদের দৈন্যতার কথা বুঝে খুবই লজ্জিত মুখে মেয়েটি কথাটা মার কাছে বলেছিল।

মেয়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে মা বললেন, বললাম তো নেই!

মেয়েটি আরো লজ্জায় ও অপমান বোধে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলো।

মা দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যেতে চাইলো। কিন্তু ছোট মেয়ে জামা ছাড়া কিছুতেই যাবে না। জামা নিয়েই সে যাবে। মেয়ের জেদ দেখে মা দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে মেয়ের মাথার পেছন দিকে গুটিকয়েক চড় বসিয়ে দিলেন। মারের ভয়ে মেয়েটি জামা রেখে দিলেও কান্না থামলো না, বরং আরো ফুলে ফুলে কাদতে লাগলো।

আমার মনটা ভিজে গেল। পকেট থেকে টাকা বের করে দোকানদারকে বললাম, পনেরোটি টাকা আমি দিচ্ছি। ওই টাকাতে আপনি তাদের জামাটা দিয়ে দিন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! দোকানদার রাজি হলেও বড় মেয়েটি তাতে রাজি হলো না।

আমার প্রস্তাবে তাদের আত্মসম্মানে লাগতে পারে তা মোটেও ভাবিনি। পরে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, টাকাটা কিছু মনে করে দিচ্ছি না। তার ছোট বোনের মতো আমারও একটি ছোট বোন আছে। তাকে মনে করেই দিচ্ছি। তবুও তাকে বোঝাতে পারলাম না। মা তাদের ছেড়ে একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফিরে এসে আমার প্রস্তাব শুনে মাও মৃদু আপত্তি জানালেন।

আসলে এটা আপত্তি ছিল না। ছিল সম্মতির বহিঃপ্রকাশ। মায়ের ওপরে মেয়েটি আর কথা বললো না।

জামাটা নিয়ে ছোট মেয়েটির নরম ছোট হাতে দিলাম। সে কান্না থামিয়ে জামাটি দেখতে থাকলো। তার মাথায় হাত দিয়ে বললাম, কি, এবার খুশি তো?

ছোট বোনটি জামা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। তার চোখে-মুখে যে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ দেখেছিলাম তা জীবনেও ভুলবো না। কেমন যেন একটা অজানা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যা মনকে যুগপৎ প্রসন্ন এবং বিষণ্ন করে দিয়েছিল।

বাসায় এসে পেপার খুলতেই দেখলাম লাল কালিতে হেডলাইনে লেখা *বাংলাদেশের মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা।*

পেপারটা রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ অনেক কিছ ভাবলাম। প্লেটো, মার্কস, লেনিন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, কুয়েত, মোজাম্বিক ও বাংলাদেশ। বিচ্ছিন্ন সব চিন্তা ভাবনা।

হঠাৎই এ.এম.এস কিবরিয়া আর সাইফুর রহমানকে পেয়ে গেলাম। ছোট বোনটির কথা বলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটির পনেরো হাজার টাকা কোথায় গেল?

তারা দুজনেই চুপচাপ নিচু মুখে চেয়ে রইলো।

ওরা দুজন প্রতিদিন এতো কথা বলে।

আজ ওরা কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

বাজেট, জিডিপি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ-এর কতো কথা ওরা বলে।

আজ ওরা বোবা হয়ে থাকলো।

চুমু

– রাশেদ

একটি দাখিল মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম। বাড়ি থেকে মাদ্রাসায় পৌছাতে এক দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যেতো। তাই একটি লজিং ঠিক করি, মাদ্রাসার ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীর বাড়িতে। সে মাস খানেক আমার সামনে রাতে পড়তে আসতো না। বিষয়টা নিয়ে খুব ভাবতাম, কি করে তাকে রাতে আমার সামনে আনা যায়।

তার চোখ দুটি দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। তাই তার কাকার কাছে একটি রিপোর্ট করলাম। স্বর্ণা ইংরেজিতে খুব দুর্বল। প্রত্যেক দিন মাদ্রাসায় এরই জন্য অন্য শিক্ষকরা আমাকে দোষারোপ করে। সে কি রাতে পড়ে না।

তার কাকা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিল, দ্রুত ইংরেজি পড়তে পারে না। সকালে স্যার তো শুধু অংক করায়, কি ভাবে পড়বে।

কেল্লা ফতে। রাতে আমার কাছারিতে পড়ার জন্য তার আসা চালু হয়ে গেল সঙ্গে তার সাত বছরের ভাইকে নিয়ে। ইচ্ছা করে মাঝে মধ্যে তার ভাইকে পানি আনার জন্য বাইরে পাঠাতাম এবং এতে দেখতাম সে খুব শংকিত হতো। পড়ার ফাকে ফাকে আমার দিকে তাকাতো। এতে খুব মজা পেতাম। টেপ রেকর্ডার থেকে কুমার সানুর একটা গান প্রায়ই ছাড়তাম –

চোখের ভাষা যদি বুঝতে পারি
না বলা কথা যদি শুনতে পারি
তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফল পাওয়া আরম্ভ করলাম।

একদিন রাতে পড়তে এসে আমার হাতে নীল রঙ–এর একটা খাম দিয়ে বললো, স্যার, এটা আপনার চিঠি। পাচ সাত সেকেন্ড চুপ থেকে বললো, আজ আমার শরীর খারাপ, পড়তে পারবো না।

তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। কিন্তু চিঠি খুলে অবাক। রক্তে রাঙানো একটা পান মার্কা (ভালোবাসার প্রতীক) কাগজ। অন্য পৃষ্ঠায় রক্ত দিয়ে লেখা ও+ী। আমার বুঝতে বাকি রইলো না এটা তার রক্ত এবং সে আমাকে ভালোবাসতে শুরু করছে। টেনশনে সারারাত ঘুমাতে পারিনি। সকালে পড়তে এলো না। দশটা বেজে গেল, আমি মাদ্রাসায় চলে এলাম।

সে মাদ্রাসায় আসেনি। আমার খুব কষ্ট হলো। কিন্তু কি জন্য তা কোনো শিক্ষককে বলতে পারিনি। বারোটার দিকে লজিংয়ে চলে আসি। এর মধ্যে আমার কাছে সংবাদ এলো, স্বর্ণা কালকে নখ কাটতে গিয়ে একটা আঙুলের মাথায় অনেকটা কেটে ফেলেছে।

পাচ ছয় দিন পর তাকে পড়ার টেবিলে পেলাম। শাড়ি পরা যেন ডানা কাটা পরী। সালাম দিয়ে চেয়ারে বসলো। তার ভাইকে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে তার হাত দেখলাম। কিন্তু সে শুধু অশ্রু ফেলছে। তাকে শুধু একটা কথাই বললাম, দাখিল পাস করো। তার কাটা আঙুলে একটা চুমু দিলাম।

এরপর থেকে প্রতি রাতে একটা চুমু রুটিন হয়ে গেল। তবে তা ঠোটে।
একদিন চুমুর দৃশ্যটা তার কাকার নজরে পড়ে গেল। এ নিয়ে তাকে অনেক মন্দ বাক্য শুনতে হলো। পরে পারিবারিকভাবে ঠিক হয়েছে, দাখিল পরীক্ষার পর তার এবং আমার বিয়ে হবে। তাদের বাড়িতে থাকলে কোনো অপকর্ম হয়ে যাবে। তাই নিজ বাড়িতে চলে এলাম।
এখন প্রতিদিন তার একটা করে চিঠি পাই, আমিও লিখি। তবে তার গোলাপ ফোটা ঠোটে চুমু ওই দিন থেকে আর দেয়া হয়নি।
কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা। এরপর ফাইনাল।
আশা আছে বাসর রাতে তাকে শুধু ঠোটে নয়, সর্বাঙ্গে ১১১১টি চুমু দেবো।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

মন্দ ভাগ্যের লোকটি

– আবদুর রউফ

স্থানীয় দৈনিকে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চোখ পড়লো।
দেশি–বিদেশি লেখকের কিছু পুরনো বই বিক্রয় হবে।
ঠিকানা দেয়া হয়েছে এ শহরেরই একটা এলাকার। জায়গাটা আমি চিনি। বই পড়া ও সংগ্রহ করা আমার বিশেষ একটা শখ। অবশ্য শখ না বলে কতোকগুলো কারণে এটাকে নেশাই বলা যায়। যেমন জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণের বদলে বই কিনি। কারণটা অবশ্যই আর্থিক সঙ্গতি। সাধ আছে, সাধ্য নেই, ব্যাপারটা এই ধরনের আর কি।
যা হোক, শস্তায় কিছু বই পেতে পারি এই আশায় একদিন সকালে রওনা হলাম বিজ্ঞাপনে দেয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে। বাড়িটা খুজতে কোনো বেগ পেতে হলো না। কেননা যে বাড়ির ঠিকানা দেয়া ছিল সেটার মালিক এই এলাকায় সুপরিচিত। তারই একজন নতুন ভাড়াটে বিজ্ঞাপনদাতা। তিনতলা বিশাল বিল্ডিংয়ের একতলার একটা অংশে নক করতে বেরিয়ে এলো বেঢপ আকৃতির কালো এক লোক। আমার আগমনের উদ্দেশ্য বলতেই দরজা খুলে ভেতরে আসার আহ্বান জানালো। একটা ঘরে দুটো কাঠের আলমারি বইয়ে ঠাসা।
লোকটি বললো, আপনি আগে বইগুলো দেখেন, তারপর কথাবার্তা হবে। এরপর আমাকে একা রেখে পাশের ঘরে চলে গেলেন।
কোনো আলমারিতেই তালা দেয়া নেই। আলমারি খুলে বইগুলোর ওপর চোখ বোলাতে শুরু করলাম।
বইয়ের সংগ্রহ দেখে খুবই প্রভাবিত হলাম। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের গুরুগম্ভীর সাহিত্যিকর্ম নেই। আবার অখ্যাত লেখকদের শস্তা বইও নেই। ঠিক যেমনটি আমার পছন্দ, বিনোদন ও অবসরের সঙ্গী হবার মতো উপযুক্ত সব বইয়ের সমাহার। বেশ কিছু ইংরেজি বই রয়েছে যার অনেকগুলো অরিজিনাল ভার্শনে পড়ার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। এখন বইগুলোর দাম আমার আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলেই হলো।
পাশের ঘরে এসে লোকটাকে একটা খাটে আধশোয়া অবস্থায় দেখলাম। আমাকে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।

এতোক্ষণ পর লোকটাকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুল একেবারে কমে যাওয়ায় আরো বয়স্ক দেখায়। চেহারা–সুরত মোটেই ভালো নয়। এ রকম একটা লোকের এসব বই সংগ্রহে আছে বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। তাই দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, বইগুলো আপনারই?

উত্তরে হ্যা সূচক মাথা ঝাকালেন লোকটা।

একটু অপ্রতিভ হেসে বললাম, এতো রিচ কালেকশন আপনার, বিক্রি করবেন কেন?

লোকটা নিরাসক্ত গলায় উত্তর দিলেন, আর প্রয়োজন নেই বইয়ের।

বলতে যাচ্ছিলাম, বইয়ের প্রয়োজন তো কখনো ফুরায় না। কিন্তু কি ভেবে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। এবার দাম–দস্তুর করা যাক। বললাম, বইয়ের দাম কেমন হবে? মানে, বলতে চাইছি কোন বইয়ে কতো পার্সেন্ট কমিশন দেবেন?

লোকটি বললেন, দেখুন, বেছে বেছে বই দেয়া যাবে না, সব বই এক সঙ্গে নিতে হবে। মোট বই আছে পাচশ ঊনত্রিশটা। প্রতিটির দাম বিশ টাকা। এই হিসাবে যা হয় তাই।

কাতর স্বরে বললাম, অনেক বইয়ের ফেস ভ্যালু দশ টাকাও আছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটির বইয়ের দাম বিশ টাকা, বেশি হয়ে যায় না?

জবাব এলো, এমন অনেক বইও আছে যেগুলোর বর্তমান দাম কমপক্ষে একশ টাকা।

আমার মুখে আর কোনো কথা যোগালো না। এ কথা সত্যি। লোকটা বইগুলোর যে দাম চাচ্ছে তা অস্বাভাবিক নয়। বেশ কিছু দুর্লভ বই রয়েছে যেগুলোর দাম বর্তমান বাজারে অন্তত আমার ধরাছোয়ার বাইরে। তবু আমার জন্য দামটা বেশি হয়ে যায়। এ নিয়ে একটু চিন্তা–ভাবনা ও তহবিল ঝাকিয়ে দেখার ব্যাপার রয়েছে। তাই বললাম, ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি। কয়েকদিন পর বলতে পারবো বইগুলো নিতে পারছি কি না।

লোকটি বললেন, কয়েকদিন অপেক্ষা করবো আপনার জন্য। ইতিমধ্যে যদি কোনো ক্রেতা এসে জোটে?

একটু তিক্ত হেসে বললাম, আমি আসার আগে যদি ক্রেতা পেয়ে যান, বেচে দেবেন। সেক্ষেত্রে আমার ভাগ্যকে মেনে নেবো।

বাড়ি ফিরে তিন চার দিন কেটে গেল। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। বইগুলো কিনে ফেললে আমার সঞ্চয় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। ওদিকে আমার পছন্দের বইগুলো হাতছাড়া করতেও মন চাইছিল না। অগত্যা ছয়দিন পর রওনা হলাম। কিন্তু একি! সেই তিনতলা বিল্ডিংটার সামনে এতো ভিড় কেন? একে–ওকে জিজ্ঞাসা করে যা শুনলাম তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

একতলার দুটো ঘর নিয়ে একা থাকতো এক লোক। নতুন ভাড়াটে। কোথায় তার বাড়ি কেউ জানে না। এমনকি বাড়িওয়ালাও জানার প্রয়োজন মনে করেননি। কেননা নিচতলার পুরোটাই মেসের মতো। শুধু চাকরিজীবী ও ছাত্ররাই থাকতো। কেউ কারো খোজ রাখতো না। দুই তিন দিন যাবৎ লোকটির ঘর–দুয়ার বন্ধ ছিল। পাশের ঘরের ভাড়াটে কয়েকদিন থেকে কেমন পচা গন্ধ পাচ্ছিল। প্রথমে সে মরা ইদুর বা ওই জাতীয় কিছু একটা মনে করেছিল। কিন্তু গন্ধ আরো বেড়ে যাওয়ায় তার সন্দেহ হয়। বাড়িওয়ালাকে সে ব্যাপারটা জানায়। বাড়িওয়ালা এলাকার প্রভাবশালী লোক। তিনি সব দেখেশুনে পুলিশের অপেক্ষা না করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে খাটের

ওপর ভাড়াটের মৃতদেহ দেখতে পান। ফুলে পচন ধরেছে লাশে। তারপর মৃত লোকটির যে বর্ণনা শুনলাম তাতে আমার কলজে হিম হয়ে গেল। আগেই সন্দেহ করেছিলাম। মৃত ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, সেই বিজ্ঞাপনদাতা, আমি টাকা পকেটে নিয়ে যার কাছে বই কিনতে এসেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি কি করবো, কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মানুষের ভিড়ের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠলো, পুলিশ! অমনি ভিড়ের অর্ধেক মানুষ নেই হয়ে গেল। পুলিশে ছুলে বত্রিশ ঘা এই আতংকে আমিও চকিতে সরে গিয়ে সোজা বাসায় ফিরলাম।

বাড়িতে কয়েকদিন খুব দুঃশ্চিন্তার মধ্যে কাটলো। যদিও ব্যাপারটার সঙ্গে আমি কোনোভাবেই জড়িত নই তবুও কেমন একটা অস্বস্তিতে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে রইলো।

যাহোক, তিন চার দিন পর ব্যাপারটা যখন প্রায় ভুলে যেতে বসেছি, একদিন সকাল ছয়টায় বাড়ির দরজায় নক হলো। দরজা খুলেই পিলে চমকে গেল, পুলিশ! মনের অজান্তে যে ভয়ে শংকিত ছিলাম তা এখন বাস্তব হয়ে আমার সামনে উপস্থিত। জানলাম, আমাকে থানায় যেতে হবে। কারণ সেই লোকটির মৃতদেহ আবিষ্কার হওয়ার কয়েকদিন আগে লোকটির কাছে গিয়েছিলাম। আমাকে সেই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে ও ঘরে ঢুকতে দেখেছে সেই বিল্ডিংয়ের এক ভাড়াটে। আমাকে সে চেনে, এমনকি বাড়ি যদিও আমি তাকে চিনি না। সুতরাং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাকে থানায় তলব করেছেন ওসি।

থানায় গিয়ে আরো বিপাকে পড়লাম। সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেও ওসিকে বোঝাতে পারছিলাম না যে লোকটির মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগসাজশ নেই। নিছক বই কেনার উদ্দেশ্যেই তার কাছে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ওসি বললেন, ঠিক আছে, আপনি নির্দোষ হলে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আপনাকে থানাহাজতে থাকতে হবে।

হাজতে একে একে তিন দিন কেটে গেল। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসতে এতোদিন লাগে! ওসি–কে তাগাদা দিতেই তিনি বললেন, বোঝেনই তো, আমাদের দেশে সব কিছুতেই ঢিলেমি। তারপর আবার সব চুপচাপ। ওসিকে একটা ব্যাপারে খুব ব্যস্ত মনে হলো।

সাত দিনের মাথায় এক কনেস্টবল এসে বললো, চলুন, ওসি আপনাকে ডাকছেন। হাজত থেকে ওসির চেম্বারে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। ওসির চেয়ারে অন্য এক পুলিশ অফিসার বসা। দিশেহারা গলায় বললাম, দেখুন, অযথা আমাকে হয়রানি করা হচ্ছে, অন্যায়ভাবে আমাকে আটকে রেখে...।

একটা হাত তুলে আমাকে থামালেন অফিসার। ইঙ্গিতে খালি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন, আমি গত পরশু এই থানায় নতুন ওসি হয়ে এসেছি। আপনার ফাইলটা আজই দেখার সুযোগ পেলাম। সেই ব্যাপারেই আলাপ করবো এখন। আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই।

আশ্বস্ত হয়ে চেয়ারে বসলাম।

ওসি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়লাম। এটা স্রেফ আত্মহত্যা। পাকস্থলিতে অ্যালকোহল, সিডেটিভ ও পয়জন পাওয়া গেছে। ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী প্রথমে প্রচুর অ্যালকোহল পান করে, মাতাল অবস্থায় প্রচুর সিডেটিভ খায় এবং সব শেষে বিষ। তবে ভিকটিম অ্যালকোহলিক ছিল না। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী প্রয়োগকৃত প্রতিটি উপাদানের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতো বলে মনে

হয়। একটু বিরতি নিলেন ওসি। তারপর কাধ ঝাকালেন। দেখে–শুনে মনে হয় এ স্রেফ মৃত্যু যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা কৌশল।

ওসি–র গলায় সহানুভূতি ও হতাশার সুর লক্ষ্য করে বললাম, লোকটিকে আপনি চিনতেন নাকি?

হাতের শেষ হওয়া সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুজে ওসি বললেন, ফুলে পচে গেলেও ফাইলে লাশের ফটো দেখেই চিনেছি। তিন বছর আগে এ ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল আমার।

কোনো কথা না বলে অপেক্ষায় রইলাম।

ওসি আবার সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিলেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে গল্প শুরু করার ভঙ্গিতে বললেন, তিন বছর আগে আমার পোস্টিং ছিল যশোরে। থানার লাগোয়া কোয়ার্টার। একদিন দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছি। একটু পরই ধরাচূড়া পরে যেতে হবে চেম্বারে। এমন সময়ে এক কনেস্টবল এসে জানালো এক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বললাম, বেশ তো, চেম্বারে যাচ্ছি, বসতে বলো ওখানে।

কনেস্টবল ইতস্তত করে বললো, কোনো কেস–ফেসের ব্যাপার না স্যার। ভদ্রলোক ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

একটু বিরক্ত হলেও রিস্টওয়াচ দেখে রাজি হলাম। অন্তত দশ মিনিট সময় দেয়া যায়। ভদ্রলোক এলে তাকে নিয়ে ড্রইং রুমে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে তারপর ভদ্রলোককে অফার করলাম। তারপর জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকালাম। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোয়া ছেড়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, একটা ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চাইতে এসেছি। কিন্তু কথাটা বলতে খুব সংকোচ বোধ করছি। আমাকে প্লিজ, ভুল বুঝবেন না। ভদ্রলোক যা বললেন তার সারমর্ম হলো : ভদ্রলোকের নাম শামসুল কবির।। বাড়ি কুষ্টিয়া। মাস্টার্স করেছেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে। একটা সরকারি দফতরে কর্মকর্তা পদে চাকরি করতেন। কিন্তু উপরওয়ালা এবং অধঃস্তনদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। কিছুদিন ব্যবসা–বাণিজ্য করেছেন। কোনো ব্যবসাতেই সাফল্য পাননি। সংসারে তেমন কেউ ছিল না। এক বোন, এক বৃদ্ধা মা। তো বোনটি বাইশ বছর বয়সে বিয়ের আগেই মারা যায় ক্যান্সারে। মেয়ের শোকে বৃদ্ধা মাও বেশি দিন বাচেননি। এখন তিনি এই পৃথিবীতে একা। কিছু জমিজমা আছে। সেগুলো দেখাশোনা করে মোটামুটি চলে যায়।

ভদ্রলোক এখনো বিয়ে করেননি যদিও বয়স হয়ে গেছে চল্লিশের উপরে। বৃদ্ধা মা যতোদিন বেচেছিলেন বিয়ের তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু বোনের বিয়ের আগে নিজে বিয়ে করতে চাননি। বোনটা চিরবিদায় নিল। তারপর তো মাও আর বাচলেন না। এদিকে বয়স বেড়ে গেল। এরপরও বিয়ে করতে পারতেন। ভদ্রলোকের আরেকটা নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। সেটা হলো এই যে, ভদ্রলোকের লালিত একটা স্বপ্ন ছিল সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা। ক্রমেই তার এই ইচ্ছাটা মানসিক রোগের মতো হয়ে দাড়ায়। তার এই ইচ্ছায় কাল হয়ে দাড়িয়েছে তার চেহারা, বয়স যাই হোক। চেহারা ও ফিগার বিদঘুটে হওয়ায় কোনো সুন্দরী মেয়েই বিয়েতে রাজি হতে চায় না, তা মেয়েটি যতোই অশিক্ষিত এবং গরিব ঘরের হোক না কেন।

তিনি বেশ বুঝতে পারেন জীবনের এই পর্যায়ে এসে একটা বিশেষ পছন্দ বা ইচ্ছাকে আকড়ে ধরে থাকা বিলাসিতা মাত্র। তার উচিত মোটামুটি যা জোটে তা মেনে নেয়া। কেননা বয়স তো বাড়ছে

বৈ কমছে না। কোনো একদিন অচল হয়ে পড়তে পারে শরীর। কঠিন রোগ–শোকে সেবা শুশ্রূষার দরকার আছে। পঙ্গু ও অসহায় জীবনের চিত্র কল্পনা করে শিউরে ওঠেন তিনি। পরের দয়া, তাচ্ছিল্য ও করুণার ওপর নির্ভরশীল অসহায় জীবনকে তার বড় ভয়। সেই সঙ্গে এও ভাবেন, নিজের পছন্দ মতো বিয়ে না করলে সেই মেয়েকে তিনি কোনোদিন ভালোবাসতে পারবেন না। নিজেকে তিনি চেনেন। স্ত্রীকে আপন করে নিতে না পারলে জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিষহ।

তিনি জীবনে কোনোদিন পতিতালয়ে যাননি। সুতরাং দেখেননি। কিন্তু বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকায় পড়েছেন। লোক মুখে শুনেছেন। ভাগ্যের ফেরে অপূর্ব সুন্দরী অনেক মেয়ে বারবনিতা পল্লীতে এসে পড়ে। সেখান থেকে তাদের মুক্তি কোনোদিন মেলে না। কোনো খদ্দেরের সঙ্গে এসব মেয়েদের হৃদয়ঘটিত ব্যাপার ঘটে গেলে, এমনকি জীবন দিয়েও তার খেসারত দিতে হয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখানকার বারবনিতা পল্লীর সেসব অসহায় সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে একজনকে উদ্ধার করে বিয়ে করবেন। না, সামাজিক নিন্দাকে তিনি কেয়ার করেন না। সমাজের লোকজনের সঙ্গে তার কতোটুকুই বা সম্পর্ক। আর পৃথিবীতে জবাবদিহি করার মতো আপনজন আছেই বা কে। তবে তিনি শুনেছেন বারবনিতা পল্লীগুলো জেলখানা সদৃশ। সেখান থেকে একটা মেয়েকে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ নিয়ে খুন–খারাপিও ঘটে। তাই এ ব্যাপারে স্থানীয় একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাহায্য পেলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

বারবনিতা পল্লীর একটা মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারটা অনেকের কাছেই নাটুকে বা পাগলামি বলে মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে মোটেই তা মনে হচ্ছিল না। মনে হলো ভদ্রলোক অনেক ভেবে–চিন্তে এই পথে এগোতে চান। এ পথে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবার কথা। লোকটা প্রতারক তা মনে করারও কোনো কারণ নেই। কেননা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আমিও লেখাপড়া শেষ করেছি। তিনি আমার অনেক সিনিয়র এবং একই ডিপার্টমেন্টের না হলেও তার ডিপার্টমেন্টের যেসব শিক্ষকদের নাম বলেছেন তাদের কম বেশি চিনি। ভদ্রলোকের যে দিকটা আমার ভালো লাগলো তা হলো, ভুয়া সমাজদরদী ও ভণ্ড রাজনীতিবিদদের মতো বীরাঙ্গনা বিয়ে করে আদর্শ স্থাপন করার বুলি আওড়াননি। তবে এটা তো সত্যি, বারবনিতা পল্লীর পংকিল জীবন থেকে একটা মেয়ে মুক্তি পাবে।

ভদ্রলোক আমার কাছে যে ধরনের সাহায্য চাইছেন তা আমার জন্য কোনো সমস্যাই নয়। তবুও এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত জানানোর আগে একটু চিন্তা–ভাবনার দরকার। ভদ্রলোক স্থানীয় একটা হোটেলে উঠেছেন। তাকে দুই দিন পর দেখা করতে বললাম।

তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেয়ার সময় সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা যায়যায়দিনের একটা বিশেষ সংখ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আপনি এই পত্রিকা পড়েন? কেমন লাগে?

বললাম, আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা।

তিনি বললেন, আমারও। তারপর একটু অপ্রতিভ গলায় বললেন, এই সংখ্যায় আমার লেখা একটা গল্প আছে। পড়ে কেমন লাগলো জানাবেন। আমি বেশ অবাক হলাম। ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে পত্রিকা উল্টে তার নামে লেখা গল্পটা বের করলাম। আমি পড়েছি, এটাই এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ গল্প। চকিতে আমার স্মরণে এলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও সাময়িকীতে কালেভদ্রে শামসুল কবিরের লেখা কবিতা দেখি। খুব উন্নত মানের কবিতা। কবি শামসুল কবির এবং যায়যায়দিনের লেখক শামসুল কবির কি একই ব্যক্তি!

বারবনিতা পল্লীগুলোতে নানান অপকর্ম ও অপরাধীদের আখড়া। সেখানে আমাদের পুলিশ সোর্স রয়েছে। তাদের মাধ্যমে বারবনিতা পল্লীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দালালকে দেখা করতে বললাম। পরদিন রাত আটটার দিকে দালাল লোকটা দেখা করতে এলো। ঢাকাইয়া ছবির ভিলেইন মার্কা চেহারা নয়। ধোপদুরস্ত, শার্ট–প্যান্ট পরা ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের হাড় জিরজিরে একটা লোক। নাম কালু। সারা মুখ ও চোখ দুটোতে শিশুর সারল্য। ফাইল পড়া না থাকলে আমার বিশ্বাস করা কঠিন হতো।

এ লোক নিজ হাতে চার চারটা খুন করেছে। পৃথিবীর সব বারবনিতা পল্লীর মতোই বাংলাদেশের বেশ্যালয়গুলোতে খুনের ঘটনায় কেউ মামলা করে না এবং কোনো সাক্ষীও পাওয়া যায় না। ইঙ্গিতে একটা খালি চেয়ারে বসতে বলে তাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুলে বললাম।

ঝাড়া পাচ মিনিট সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলো কালু। তারপর চোখ নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, *হাসি স্যার।*

ভ্রূ কুচকে বললাম, মানে?

কথার রেশ ধরে রেখে কালু বললো, তিন মাস হলো পাড়ায় এসেছে। পরীর মতো দেখতে। নাম হাসি। ম্যানেজ করা যাবে স্যার। তবে ত্রিশ হাজারের কমে হবে না। ক্যাশ।

কালুকে অপেক্ষা করতে বলে হাতের কাজগুলো সেরে হোটেলে টেলিফোন করলাম। শামসুল কবিরকে পাওয়া গেল। সব শুনে তিনি বললেন, ওকে, আমি এখনি রওনা হচ্ছি কুষ্টিয়া। আগামীকাল ফার্স্ট আওয়ারে ব্যাংক থেকে টাকা তুলেই ফিরে আসবো। মেয়ে যদি পছন্দ হয় তাহলে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলবো। রিসিভার নামিয়ে রেখে আগামীকাল বেলা একটায় মেয়েকে নিয়ে সিটি হোটেলে আসতে বলে কালুকে বিদায় করলাম।

পরদিন অফিসের কাজের চাপ যখন একটু কমলো তখন পৌনে একটা বাজে। আগেই টেলিফোনে হোটেলের ম্যানেজারকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে রেখেছিলাম। একটা মেয়েকে নিয়ে কিছু লোকের আনা–গোনা হোটেলের বয়–বেয়ারা ও বোর্ডারদের মধ্যে যাতে কোনো খারাপ সন্দেহের সৃষ্টি না করে, সেদিকটা যেন সে দেখে। একটা পাচ মিনিটে মোটর সাইকেল নিয়ে হোটেলে পৌছলাম। আগেই জেনে নেয়া বত্রিশ নাম্বার রুমে ঢুকে শামসুল কবিরকে উদ্বিগ্ন অবস্থায় দেখলাম। কালু এখনো এসে পৌছাইনি। রুমে বসে একটা সিগারেট ধরালাম।

সোয়া একটায় কালু এলো। সঙ্গে বোরখা পরা একজন। বুদ্ধি করে কালু মেয়েটিকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে এসেছে। ঝানু লোক। অহেতুক লোকজনের দৃষ্টি কাড়তে চায় না। ঘরে ঢুকেই কালু মেয়েটিকে হোটেলের বিছানায় বসতে বললো, নিজে একটা চেয়ারে বসলো। বিছানার এক কোণায় একটা জড় পদার্থের মতো মেয়েটি বসে রইলো। তার মুখ এখনো বোরখায় ঢাকা। আমি ও শামসুল কবির অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এবার কালু মেয়েটিকে বোরখা খুলতে বললো। মেয়েটি বোরখা পুরোটা খুলে ফেললো।

এতোটুকুও বাড়িয়ে বলেনি কালু। সত্যিই পরীর মতো দেখতে মেয়েটা। বছর পচিশেক বয়স। দুধে–আলতা গায়ের রঙ। লাবণ্য আর কমনীয়তায় ভরা অঙ্গ সৌষ্ঠব। চোখে–মুখে গ্রাম্য ললনার সারল্য। এ রকম একটা রূপবতী মেয়ে কিভাবে নিষিদ্ধ পল্লীতে এলো তা ভেবে বিস্মিত হলাম। নিশ্চয়ই কোনো মদ্যপ, প্রতারক, হৃদয়হীন স্বামী, ভাই বা বাপের কাণ্ড।

বলা বাহুল্য, শামসুল কবিরের অপছন্দ হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। চোখে মুখে সন্তুষ্টির চিহ্ন দেখে তা বোঝা গেল। মেয়েটির চোখে অনিশ্চয়তার গভীর ছায়া। উত্তপ্ত কড়াই থেকে জলন্ত উনানে গিয়ে পড়ার আশংকায় শংকিত সম্ভবত। এরপর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো।

শামসুল কবির চান আজই এ হোটেলে বিয়েটা সেরে ফেলতে। আমিও তাই চাই। আপাতদৃষ্টিতে অপ্রীতিকর কাজটা যতো দ্রুত সমাধা হয় ততো ভালো।

কালুকে বললাম সব ব্যবস্থা করতে পারবে কি না। কালু রাজি। শামসুল কবির তিনটা বান্ডলে ত্রিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন কালুর হাতে। কালু বেরিয়ে গেল ব্যবস্থা করতে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলো একজন কাজিকে নিয়ে। মেয়ের পক্ষে সাক্ষী হলো কালু ও হোটেলের একজন বেয়ারা। অফিশিয়াল জটিলতা থাকায় আমার সাক্ষী হওয়া হলো না। পাত্রের পক্ষে সাক্ষী হলো হোটেলের ম্যানেজার এবং মুরুব্বি গোছের একজন বোর্ডার।

শাদামাটা বিয়ে খুব সহজেই মিটে গেল। মেয়েটির চোখে এখন উদ্বেগের পরিবর্তে গভীর কৃতজ্ঞতার ছায়া। আমার জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

বিয়ে পড়ানোর পর পরই কালু ত্রিশ হাজার টাকার পুরোটাই মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে আবেগঘন গলায় বললো, টাকাগুলো রাখো হাসি। কয়টা মাস দোজখে ছিলে। মাফ করে দিও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলাম, উপযুক্ত পরিবেশ ও আবহ তৈরি হলে মানুষ নামের নরাধমও কতোটা মানবিক হয়ে উঠতে পারে। অনেক পীড়াপীড়ি করে শামসুল কবির দশ হাজার টাকা নিতে বাধ্য করলো কালুকে। কারো কোনো কথাই শুনলো না কালু। ঢালাও খাবারের অর্ডার দিল। সেদিনই সন্ধ্যার পর পর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে কুষ্টিয়া রওনা হয়ে গেল শামসুল করিব। বিদায় নেয়ার আগে শামসুল কবিরকে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কবিতাও লেখেন নাকি?

উত্তরে শামসুল কবির আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, মাঝে মধ্যে।

শেষ হলো শামসুল কবিরের উপাখ্যান। তিন বছর আগে যশোরে যে উপাখ্যানের সূচনা করেছিলেন ওসি, আজ তিনি রাজশাহীতে এই থানায় বসে সেই উপাখ্যানের সমাপ্তি টানলেন।

কিছুক্ষণ থেকেই একটা প্রশ্ন আমার মধ্যে মাথার মধ্যে ঘুরছিল। ব্যাকুল স্বরে ওসিকে বললাম, শামসুল কবির তো আত্মহত্যা করলো। কিন্তু হাসির কি হলো।

ওসি বললেন, কুষ্টিয়া থানার ওসিকে টেলিফোন করে সব বিস্তারিত জানার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তাছাড়া কেসের স্বার্থও এটা করার দরকার ছিল। আজ সকালে কুষ্টিয়া থানার ওসি শামসুল কবির সম্পর্কে বিস্তারিত খোজখবর নিয়ে সব আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন ওসি। আমি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। একটা সিগারেট ধরালেন ওসি। ধোয়ায় তার মুখটা ঢাকা পড়লো। ধোয়ার আড়াল থেকে তার কণ্ঠস্বর ভারী শোনা গেল।

ছয় মাস আগে ব্রেন ক্যান্সারে মারা গেছে হাসি। শামসুল কবির জমি-জমা, বাড়ি-ঘর বেচে হাসিকে কলকাতা, মাদ্রাজ, এমনকি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সব বৃথা। একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল ক্যান্সার। হাসি মারা যায় সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে ফেরার পাচ দিন পর।

কিন্তু শামসুল কবির আত্মহত্যা করলেন কেন? হাহাকারের মতো শোনালো আমার কণ্ঠস্বর।

জবাবে ওসি অসহায়ভাবে কাধ ঝাকালেন।

সেটা কোনোদিনই জানা যাবে না। জবানবন্দিমূলক কোনো কিছু লিখে রেখে যাননি তিনি। তার সব বইপত্র আমরা সিজ করেছি, কিছু পাইনি।

এক সপ্তাহ পর প্রায় বন্দী জীবন থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলাম থানা থেকে। উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো–বাতাসে নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো মনে হলো। পৃথিবীর এই আলো–বাতাস গায়ে মেখে বেচে থাকার যে অপার আনন্দ তা উপেক্ষা করে শামসুল কবির আলিঙ্গন করে নিল মৃত্যুকে। জীবন যুদ্ধে পরাজিত জীবনের সাধ–আহ্লাদের কাছে প্রতারিত, বিপর্যস্ত শামসুল কবির। এবং হাসি নামে সেই হতভাগ্য মেয়েটি যার জীবনের রজনীগন্ধাগুলো শ্বেতশুভ্র হাসি হয়ে আর ফুটলো না।

মন্দ ভাগ্যের এই দুজনার কথা ভেবে তীব্র বিষাদে ছেয়ে গেল মন।

সাগরপাড়া, রাজশাহী থেকে

সনিআপুর কাছে খোলা চিঠি

সনিআপু,

তুমি কোথায়? সেই ৮ জুন সকালে অংক কষার তাগিদ দিয়ে যে বুয়েটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে গেলে, আর বলে গেলে, কমপিউটার নিয়ে বাসায় ফিরবে। কই, তুমি তো ফিরলে না? কিন্তু কেন?

তুমি আমার প্রতি কি এখনো রাগ করে আছো রাতে অংকটি না পারার জন্য? অংকটি আমি এখন করতে পারি। কিন্তু তুমি অভিমান করে আছো কেন?

জানো আপু, আমি এখন লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ দিয়েছি। শুধু কথা দাও কমপিউটারটি নিয়ে আসবে, আমার খুব ইচ্ছে কমপিউটার চালাতে, বলো না কবে আসবে?

রাতে দাদুর পাশে তোমার কথা মতো শুই। কিন্তু ঘুম আসে না। সকালে উঠে নামাজ পড়তে মসজিদে যাই। তবে তোমাকে ছাড়া টিভিতে ভূতের গল্পের ছবি, বিজ্ঞানের সেই কল্পকাহিনীর বইগুলো পড়তে আর ভালো লাগে না।

তুমি তো বলতে, আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে, এখন দেখছি তোমার সব কথাগুলোই শুধু ফাকি। তুমি আমাকে কেন ফাকি দিলে আপু? সামনে ঈদুল ফিতর, অথচ তুমি নেই। গত ঈদের কথা কি তোমার মনে আছে? কি মজাটাই না করেছিলাম আমরা। উত্তরা মডেল টাউনে প্রথম ঈদের কেনাকাটা। তুমি, আমি, আব্বু, আম্মু, ভাইয়া ঈদের কাপড় কিনতে গিয়ে তুমি আমার পায়জামা, পাঞ্জাবি পছন্দ করে দিয়েছিলে। ঈদের দিন তোমার বানানো কাস্টার্ড ও ডিমের পুডিং সবাই কি মজা করেই না খেয়েছিলাম।

কি মজাই না হয়েছিল ঈদের পরের দিন। ছোট খালার উদ্যোগে সবাই সাভার স্মৃতিসৌধে গিয়ে সারাদিন গল্প–গুজব আর আড্ডায় কাটানো, মনে পড়ে আপু, আব্বু যখন তোমার প্রিয় বাদাম কিনে আনলেন সেই সময় তুমি তেতুলের আচার খাচ্ছিলে, তা নিয়ে সবাই কি হাসাহাসি না

করেছিল। তুমি বাদাম খেতে না পারায় সেই দিন খুব আফসোস করেছিলে। অথচ আজ ঈদে সবাই আছে, নেই শুধু তুমি! তোমাকে ছাড়া যে আমার কিছুই ভালো লাগে না।

জানো আপু কান দুটোতে এখন আর ব্যথা করে না। তুমি ছাড়া তো কানমলে দেয়ার কেউ নেই। আপু কোনোদিন কি আসবে না? আব্বু, আম্মু, দাদু সবাই তোমার জন্য শুধু কাদে। একটিবার আসো না আপু, শুধু একটিবার এসে আমাকে বকে যাও না আপু, শুধু একটিবার...

তোমার স্নেহের

রানা

উত্তরা, ঢাকা থেকে

*সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনির ছোট ভাই উত্তরা মডেল হাই স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র **রানা** (১১) তার প্রয়াত বোনের উদ্দেশে এই খোলা চিঠিটি লিখেছে।*

- যাযাদি